স্বদেশ
সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 4, Issue No. 6, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, March 2015

হিন্দু সংহতি

"নাট্যজগতের লোকেরাও তাই। হিন্দুর ছেলে মুসলমান মেয়েকে ভালোবাসবে এবং নানা বাধা বিপত্তি ও নাট্য সংঘাতের মধ্য দিয়ে তাকে বিবাহ করবে, এমন নাটক হয়না কেন? প্রথম কারণ পয়সা বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কারণ এধরণের সম্প্রীতি মুসলমানেরা সহ্য করবে না।"

—শিবপ্রসাদ রায়

৭ম বর্ষপূর্তি উদযাপনে

হিন্দু সংহতি-র ঐতিহাসিক সমাবেশ

হিন্দু সংহতির লড়াইকে আজ বাংলার মানুষ গ্রহণ করেছে। হিন্দু ধর্ম রক্ষার জন্য তারা আজ হিন্দু সংহতির পতাকা তলে সমবেত হচ্ছে। হিন্দু সংহতির ৭ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ধর্মতলার রাণী রাসমণি এভিনিউয়ে হাজার হাজার মানুষের জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একথাই বললেন হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তপন ঘোষ। বাস্তবিকই এই জনসভায় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার মানুষ এই জনসভায় উপস্থিত হয়েছিল, যা সকলেরই নজর কেড়েছে।

এদিনের জনসভায় বক্তব্য রাখেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পূজ্য স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজ, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তামিলনাড়ুর হিন্দু মাক্কাল কাচ্চি-র সভাপতি অর্জুন সম্পত। এছাড়া বক্তব্য রাখেন লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ গৌতম সেন, আমেরিকা থেকে এসেছিলেন ডঃ রিচার্ড বেঙ্কিন, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে এসেছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তথা পীস ক্যাম্পেন গ্রুপের সভাপতি করুণালঙ্কার ভিক্ষু, হুগলির কৈকালার ব্রহ্মচারী সুনীল মহারাজ এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়।

সভাপতি তপন ঘোষ বলেন, হিন্দু সংহতি ৭ বছরের কৈশোর শেষ করে ৮ বছরে পড়ল, অর্থাৎ আজ আমরা বালকত্বে পড়লাম। বালকত্বে পড়লেও হিন্দু সংহতির শক্তি সামর্থ্য কেমন হবে তা বোঝাতে গিয়ে তিনি বালক শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ধ্বংস করতে হিন্দু সংহতি যেন বালক কৃষ্ণের ভূমিকা নিতে পারে। কর্মীদের প্রতি তাঁর নির্দেশ, নিরাপত্তার জন্য পুলিশের দিকে তাকিয়ে থেকো না। যে পুলিশ কয়েকজন মুসলিমের আক্রমণের মুখে নিজেদের জীবন বাঁচাতে দৌড়ে পালায়, দুষ্কৃতিদের আক্রমণে নিজেদেরই রক্ষা করতে পারে না, তারা কি করে হিন্দুদের নিরাপত্তা দেবে? হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি, মা-বোনেদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে হিন্দুদেরই জ্বলে উঠলে হবে।

হিন্দু সংহতির কর্মীদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে সে প্রসঙ্গে তপন ঘোষ বলেন, আমরা কোনও বিশেষ দলকে সমর্থন করব না। এই প্রসঙ্গে তিনি কংগ্রেস, সিপিএম এবং তৃণমূলের মুসলিম তোষণ নীতি তুলে ধরেন। বলেন, আমরা দীর্ঘদিন কমিউনিস্টদের মুসলিম তোষণ দেখেছি, এখন মমতার মুসলিম তোষণও দেখছি। পাশাপাশি মুসলিমরা কিভাবে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি ব্যবহার করছে সেই প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সৌকত মোল্লা বা শাহজাহান শেখরা এক সময় বামফ্রন্টকে ব্যবহার করেছে। এখন সেই তারাই তৃণমূলে গিয়ে ভিড়েছে। বিজেপিও যে মুসলিম তোষণে পিছিয়ে নেই সেই প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। তিনি বলেন এই রাজ্যে বিজেপি করতে গিয়ে বহু হিন্দ মার খেয়েছেন। উত্তর ২৪ পরগণার সন্দেশখালিতে তৃণমূল সমর্থিত মুসলিমদের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন হিন্দু বিজেপি সমর্থকরা। অথচ ধর্মতলার জনসভায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ শুধু বীরভূমে আক্রান্ত হওয়া চারজন মুসলিম সমর্থকের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা দিলেন। তাই কর্মীদের প্রতি তপন ঘোষের সাবধানবাণী, ঝাণ্ডার রং দেখে বোকা বনবেন না। এই ক্ষেত্রে মুসলিমদের থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। তারা যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে ব্যবহার করে আমাদেরও তেমন করতে হবে। যতক্ষণ না কোনও হিন্দু দল পাচ্ছি, সব দলকে সমান চোখে দেখব। তাই কর্মীদের প্রতি তাঁর নির্দেশ হিন্দু সংহতি করার জন্য কোন রাজনৈতিক দল ছেড়ে আসতে হবে না। বরং যে রাজনৈতিক দল করছ সেটা ভাল করে করো। ওই দলে থেকেই সৌকত মোল্লা, সাজাহান শেখদের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করতে হবে। মনে রাখতে হবে আমরা হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য একটি অরাজনৈতিক দল করেছি। এই দলকে যারা সমর্থন করবে আমরা তাদের সহযোগিতা করব।

জনসভায় উপস্থিত হাজার হাজার হিন্দু যুবক যুবতীর প্রতি তাঁর আশ্বাস, আপনারা গ্রামগঞ্জে মুসলিম আধিপত্যের বিরুদ্ধে যে লড়াই করছেন তাতে আপনারা একা নন। আজ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে হিন্দুরা জাগছে। আমাদের লড়াইয়ে ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের হিন্দু সংগঠনও সাহায্য করছে। এমনকি আমেরিকা, ইংল্যান্ডের হিন্দুরাও এবং যারা হিন্দু নন অথচ মুসলিম সন্ত্রাসে বিপর্যস্ত তারাও হিন্দু সংহতির আন্দোলনকে সমর্থন করছে—সহযোগিতা করছে। তাই সংগঠনের কর্মীদের প্রতি তাঁর আবেদন, পাশের গ্রামে যদি হিন্দুদের উপর আক্রমণের খবর পান তাহলে সেখানে ছুটে যাবেন, তাহলে প্রয়োজনে তারাও আপনাদের প্রয়োজন আসবে। পুলিশের ওপর ভরসা না করে নিজেরাই এগিয়ে চলুন--- এটাই মূলবার্তা।

ডঃ রিচার্ড বেনকিন বলেন যে, ১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে বারমুডা দ্বীপে একটি গোপন বৈঠক হয়, নাৎসী জার্মানীতে ইহুদীদের উপর যে নৃশংস অত্যাচারের খবর আসছে বিভিন্ন সূত্র থেকে তা আলোচনা করার জন্য। আলোচনায় স্থির হয় যে অত্যাচারের খবর অধিকাংশই রটনা এবং এ বিষয়ে দুই বৃহৎ শক্তি সে রকম কিছুই করার নেই। ৬০ বছর আগে ইহুদিদের সঙ্গে যা হয়েছিল সেই একই নির্মম অত্যাচার ঘটে চলেছে মধ্যপ্রাচ্যে ইয়াজিদি জনজাতির উপর আর বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর। ইয়াজিদিদের উপর কিছুদিন হল অত্যাচার শুরু হয়েছে আর বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর এই অত্যাচার কয়েক দশক ধরে চলেছে। বৃহৎ শক্তিদের মনোভাব এখনও তথৈবচ। তাদের মতে, অধিকাংশই মনগড়া গল্প আর আমাদের কিছু করার নেই। তাই আজকে ইহুদি থেকে ইয়াজিদি হোক বা বাংলাদেশের হিন্দু হোক, আমাদের জন্য কেউ কিছু করতে আসবে না। আমাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরকেই করতে হবে।

স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ বলেন, শুধু রাম-রাম বা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ জপ করলে হিন্দু ধর্মরক্ষা হবে না। যেমন টাকা টাকা বললেই টাকা হয় না। তাই রাম বা কৃষ্ণ জপ করলে উদ্ধার হবে না বরং তাদের জীবনকে স্মরণ করতে হবে। ভগবান রামচন্দ্রকেও সীতা মা'কে উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করতে হয়েছে। আবার কুরুক্ষেত্রে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। যারা পাণ্ডবদের রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিল তাদের থেকে যুদ্ধ করে রাজ্য উদ্ধারের কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিমদের পূর্ববঙ্গ ছিনিয়ে নেওয়ার কথা তুলে ধরেন।

এ প্রসঙ্গে স্বামী তেজসানন্দ মহারাজ বলেন কাপুরুষতা ভীরুতা মহাপাপ। উপস্থিত হাজার হাজার হিন্দুর উচ্ছ্বাস দেখে তিনি বলেন, আজ সাধু-সন্ন্যাসীরাও আপনাদের এই লড়াইয়ে সঙ্গে আছেন। তাঁরা আর শুধু মালা জপে ধর্মপালন করবেন না। হিন্দু ধর্মরক্ষার জন্য সাধুরাও আজ লাঠি, ত্রিশূল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। নিজের ধর্ম, জাতীয়তা, সংস্কৃতি, আমাদের দেবদেবীকে রক্ষার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। ধর্মকে রক্ষার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হব। আজ হিন্দুত্বের জনজোয়ার এসেছে। তাই ভীরুতা, কাপুরুষতা ত্যাগ করে এগিয়ে যেতে হবে। ব্রহ্মচারী সুনীল মহারাজ প্রত্যেক হিন্দুর বাড়িতে একটি তুলসী গাছের পাশাপাশি একটি তলোয়ার এবং ত্রিশূল রাখার পরামর্শ দেন।

শেষাংশ ২ পাতায়

আমাদের কথা

"কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যা রবি"

কবিগুরুর এই বিখ্যাত উক্তি দিয়ে এবারের লেখা শুরু করছি। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সংকটজনক অবস্থায় কবির এই লাইনটি কতটা প্রাসঙ্গিক তা একটু চোখ-কান খোলা রাখলেই বোঝা যায়। একবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই পশ্চিমবঙ্গে ইসলামিকরণের কাজটা দ্রুত করতে চেয়েছে দেশে-বিদেশ থাকা বিভিন্ন ইসলামিক সংগঠন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ বা শহরের মতো এখানে জঙ্গি হানাকে তারা হাতিয়ার করেনি। এখানে তাদের শক্তির মূল উৎস পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী সাধারণ সংখ্যালঘু সমাজ। ধর্মভীরু মুসলমানরা মসজিদ, মাজার বা মাদ্রাসায় যাবেই, আর সেখান থেকেই তাদের জেহাদী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এটাই তাদের সংকল্প। পশ্চিমবঙ্গে তাই বোমা বিস্ফোরণ, গুলি চালনার দরকার নেই—এখানে সাধারণ মুসলমানরাই বোমা-গুলির কাজ করবে। এইভাবে তারা দার-উল-হার্ব পশ্চিমবঙ্গকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে তারা পশ্চিমবঙ্গে ত্রিমুখী পরিকল্পনা নিয়েছে—ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের নির্দেশ মতো পরিচালনা করা, লাভ জেহাদের মাধ্যমে হিন্দুর মেয়েকে বিয়ে করে নিজের সমাজের জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের জনসংখ্যার উপর আঘাত হানা, আর ল্যাণ্ড জেহাদের মাধ্যমে হিন্দুর জমি দখল এবং খাস জমিগুলো দখল করে মুসলিম কলোনী গড়ে তোলা। বলতে কোন দ্বিধা নেই যে গত ১৫ বছরে এ ব্যাপারে তারা অনেকটা সফল। পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলা—মালদা, মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুরে মুসলিমরা আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ। দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাট বা উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গা পুরোপুরি ওদের হাতে চলে গেছে। আর যেখানেই মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে সাধারণ হিন্দুর উপর অত্যাচার বেড়ে গেছে। হিন্দুর ঘর-বাড়ি পুড়েছে, জমি দখল হয়ে গেছে, অসংখ্য হিন্দু মেয়ে সমাজ থেকে হারিয়ে গেছে, মঠ-মন্দির ভেঙেছে, ঠাকুর অপবিত্র করেছে। এরকম আরও ছোটো-খাটো টোকা তারা হিন্দুদের গত ১৫ বছর ধরে দিয়ে চলেছে—সংখ্যাটা কয়েক হাজার হবে। এগুলো সবই তাদের বড় ম্যাচ খেলার আগে প্রস্তুতি। প্রতিপক্ষকে একটু বাজিয়ে নেওয়া।

কিন্তু বড় ম্যাচ খেলার জন্য হিন্দুরা কতটা প্রস্তুত? মনে হয় সিকিভাগও নয়। ভারতের বৃহত্তম অরাজনৈতিক হিন্দু সংগঠনটি পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে উদাসীন। তার সহযোগীদের অবস্থাও তথৈবচ। হিন্দু মঠ-মন্দির বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীরাও আজ সেক্যুলার হয়ে গেছে। ঠাকুরের 'যত মত তত পথ'-এর অপব্যাখ্যা চলছে সর্বত্র। ক্ষমাই পরম ধর্ম আর সেবাই পরম লক্ষ্য হয়ে উঠেছে সবার। তাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে মার খেলে, তাদের দ্বারা ভিটে-মাটি ছাড়া হলে, ঘর-বাড়ি পুড়ে আশ্রয়হীন হলে দ্রুত ত্রাণ নিয়ে হাজির হওয়াতে এদের জুড়ি মেলা ভার। প্রথমে কুম্ভীরাশ্রু প্রদর্শন, তারপর ত্রাণ দিয়ে পুনর্বাসন—ব্যাস্, সব দায়িত্ব পালন হয়ে গেল। সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আবার যদি ঘরবাড়ি পোড়ায়, লুঠপাট চালায় ক্ষতি কী, আবার আমরা ত্রাণ নিয়ে হাজির হব। অথচ কক্ষনো প্রতিবাদ প্রতিরোধের কথা বলবো না। যা করলে এই অত্যাচার বন্ধ হবে, সেই পথ দেখাবো না। 'ইঁটের বদলে পাটকেল'—এই প্রবাদটা বাঙালি বুদ্ধিজীবি থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই ভুলে গেছে। আর রাজনীতির নেতারা তো আছেনই সবকিছু ধামা চাপা দেওয়ার জন্য। এদের সমবেত প্রচেষ্টায় বাঙালি হিন্দু আজ অনেকাংশেই নপুংসক-এ পরিণত হয়েছে। এটাই তো চায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংগঠনগুলি। তাদের দার-উল-ইসলামের পথ তৈরি করে দেবে এদেশের সেক্যুলার হিন্দুরাই।

পশ্চিমবঙ্গের বুকে এমনই ঘনঘোর অন্ধকার রাতে মাটির প্রদীপ হয়ে আবির্ভাব হিন্দু সংহতির। ২০০৮ সালে। প্রথম দিন থেকেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পথে হাঁটছে সংগঠন। এ পথেই বাঙালি হিন্দুর একমাত্র বাঁচার আশা তা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বোঝাচ্ছে তারা। অন্যান্য প্রদেশে বা শহরে বিস্ফোরণে মানুষ মরতে পারে, কিন্তু তাদের পায়ের তলার জমি হারাবার ভয় নেই। কিন্তু বাঙালির আছে। একবার গেছে, আবার যাবার পথ প্রস্তুত হচ্ছে। শান্তির ললিতবাণী ব্যর্থ পরিহাসের মতো শোনাচ্ছে। তাই দানবের সাথে সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে আজ ঘরে ঘরে। হুঁশিয়ার বন্ধু, হুঁশিয়ার।

দিনান্তে রবি অস্ত যায়। পৃথিবীতে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। তখন কারো কে না কারোকে আলোকদানের সুমহান দায়িত্ব নিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যাকাশে রবি অস্তমিত হলেও আলোকবর্তিকা নিয়ে এগিয়ে এল না কোন হিন্দু সংগঠন। ক্ষুদ্র হলেও একা হিন্দু সংহতি সেই সুমহান দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। প্রজ্জ্বলিত অগ্নির লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ুক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। আমরা হার মানবো না, ভিটেমাটি ছাড়বো না, যতদিন না পশ্চিমবঙ্গের আকাশে নতুন সূর্যের আবির্ভাব হচ্ছে।

১ম পাতার শেষাংশ

হিন্দু সংহতি-র ঐতিহাসিক সমাবেশ

লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ গৌতম সেন বলেন, আমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে নই, কিন্তু আমার ধর্ম আক্রান্ত হলে জীবন দিয়ে দেব। হিন্দুস্বার্থে তপন ঘোষের লড়াইকে তিনি শিবাজী এবং গুরুগোবিন্দ সিং-এর লড়াইয়ের সঙ্গে তুলনা করেন। উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ সিং যে যুদ্ধ করেছিলেন, আপনারাও সেই লড়াই করছেন। আর এই লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছে তপনদা।

হিন্দু মাক্কাল কাচ্চির সভাপতি অর্জুন সম্পত বলেন, বাংলায় অনেক নেতা আছেন। কিন্তু তারা সব জাতীয় নেতা—একজনও হিন্দু নেতা নেই। তপন ঘোষই একমাত্র হিন্দু নেতা। তিনি বলেন মুসলিম সমস্যা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সারা দেশেই এই সমস্যা। যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়ছে সেখানেই সমস্যা। সেখানে আর ভারতের শাসন চলে না—জামাতের আইনই সেখানে শেষ কথা। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুসলিম তোষণের সমালোচনা করেন। রাজনৈতিক দলগুলির ধর্মনিরপেক্ষতার তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। বলেন, কোনও মুসলিম বা খ্রিস্টান আক্রান্ত হলে সব দলই তাদের পাশে দাঁড়ায়, কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে কেউ যায় না। এটাই কি ধর্মনিরপেক্ষতা? আসলে মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি তাদের পাশে দাঁড়ায়। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে তাই হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে হবে।

হিন্দু মাক্কাল কাচ্চি-র সভাপতি অর্জুন সম্পত তপন ঘোষকে একটি উত্তরীয় এবং বিশেষ ধরণের পাগড়ি পড়িয়ে সম্বর্ধনা জানান।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

মুসলিম আগ্রাসন ঃ ঘরছাড়া টিটাগড়ের হিন্দু শ্রমিক

একদিকে মুসলিম আগ্রাসন, অন্যদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের ষড়যন্ত্র। এই দুইয়ের যাঁতাকলে পড়ে এক এক করে এলাকা ছাড়া হচ্ছে হিন্দুরা। এখনও যারা মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছেন তাদের উচ্ছেদ করতে নিয়মিত হুমকি এমনকি মারধোরও করা হচ্ছে। ফলে অবশিষ্ট হিন্দুরা এখন উৎখাতের ভয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। এলাকাটি উত্তর ২৪ পরগণার টিটাগড় থানার অন্তর্গত। থানা টিটাগড় হলেও টিটাগড় স্টেশনের কাছেই এই পৃথিবীনগর এলাকাটি ব্যারাকপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে।

প্রায় ৪০ বছর আগে ১৯৭৫ সাল নাগাদ এই এলাকায় প্রথম বাড়ি করেন পৃথিবী চৌধুরী। তিনি জুটমিলের শ্রমিক ছিলেন। কাজ করতেন ইএমসিও (ইস্টার্ণ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি)-তে, স্থানীয় মানুষের কাছে যা ফিতাকল হিসাবে পরিচিত। এই কারখানার উল্টোদিকে রাস্তার উপরেই ছিল বিশাল একটা জলাজমি। স্থানীয় মানুষজন সেটাকে ফিতাকলের জমি বলেই জানতেন। তাই কারখানার শ্রমিক পৃথিবী চৌধুরী সেই জলাজমির একটুকরো ভরাট করে ছোট একটা ঘর করে বসবাস করতে শুরু করেন। পরে তাঁর সহকর্মীদেরও সেখানে বসবাস করার জন্য উৎসাহিত করেন. তাঁর কথায় ধীরে ধীরে সেই জলাজমি ভরাট করে বসবাস শুরু করেন শ্রমিকরা। একে একে ৪০টি শ্রমিক পরিবার সেখানে থাকতে শুরু করেন। এদের মধ্যে ২ ঘর ছিল মুসলিম বাকি ৩৮টি হিন্দু পরিবার ছিল। এলাকার প্রথম বাসিন্দা পৃথিবী চৌধুরীর নামে ওই বস্তির নাম হয় পৃথিবীনগর। জুটমিলের শ্রমিকরা সেখানে বসবাস শুরু করায় মিল কর্তৃপক্ষ সেখানে পানীয় জলের জন্য ২টি ট্যাপ ওয়াটারের ব্যবস্থা করে দেয়। এছাড়া মহিলাদের ব্যবহারের জন্য ৬টি এবং পুরুষদের ব্যবহারের জন্য ১২টি শৌচালয় তৈরি করে দেয়। বসতি স্থাপনের সময় কেউ কোন বাধা দেয়নি। তারপর থেকে ২৫ বছর নিশ্চিন্তেই বসবাস করছিলেন তাঁরা। বিপত্তি শুরু হয় ২০০১ সাল থেকে। এই বস্তি এলাকার পাশে আরও কয়েক বিঘা জলাজমি পড়ে ছিল। বস্তির বাসিন্দারা জানিয়েছেন ২০০১ সালে সেই জলাজমি ভরাট শুরু করেন এলাকায় সিপিএম নেতা বলে পরিচিত আনন্দ কুর্মী। জমি ভরাট করে বিক্রি শুরু হয়। সমস্ত জমিই বিক্রি করা হয়েছে মুসলিমদের কাছে। সেখানে পাকাবাড়ি তৈরি করে মুসলিমরা বসবাসও শুরু করেছে। সেই ফাঁকা জমি শেষ হওয়ার পরই নজর পড়েছে হিন্দু অধ্যুষিত এই পৃথিবীনগর বস্তির ওপর। বস্তিবাসীরা জানিয়েছেন সিপিএম নেতা আনন্দ কুর্মী নিজেকে এই জমির মালিক বলে দাবি করেছেন। এবং এই জমি বিক্রির জন্য স্থানীয় কংগ্রেস নেতা প্রেমনাথ কুর্মীকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়েছেন। তারপর থেকেই বস্তির বাসিন্দাদের উচ্ছেদের জন্য শাসানি এবং মারধোর শুরু হয়েছে। মারধোরের মুখে পড়ে সামান্য টাকার বিনিময়ে অনেকেই ঘর ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। ইতিমধ্যেই ১৯ ঘর হিন্দু পরিবার চলে গেছেন। সেইসব ঘর বিক্রি করা হয়েছে মুসলমানদের কাছে। তাঁরা সেখানে বসবাসও শুরু করেছেন। বাকি ১৯ ঘর হিন্দুকেও উৎখাতের ষড়যন্ত্র চলছে।

এলাকার মহিলাদের জন্য একটি স্নানাগার ছিল। সম্প্রতি বেবি নামে এক হিজড়া এসে দাবি করে সেটি তিনি কিনে নিয়েছেন। এরপরই লোকজন নিয়ে এসে জোর করে পাঁচিল তুলে সেটি বন্ধ করে দেয়। সেই ঘরেই ছিল কোম্পানির দেওয়া ট্যাপকল এবং সেখান থেকেই খাবার জল নিতেন বস্তিবাসীরা। এছাড়া আরও একটি ট্যাপকল রয়েছে। সেই ট্যাপকলের পাশে সকলের ব্যবহারের জন্য একটি পাতকুঁয়া এবং কিছুটা ফাঁকা জায়গা ছিল। সম্প্রতি গফুর নামে এক হিজড়া এসে দাবি করে পাতকুঁয়া সহ ফাঁকা জমিটি সে কিনে নিয়েছে। অথচ এমকো কোম্পানী আগেই নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে যে, এই জায়গা কেউ বেচাকেনা করতে পারবে না। এরপরই লোকজন এনে পাতকুঁয়া বন্ধ করে ফাঁকা জায়গাটি পাঁচিল তুলে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। শুধু পাতকুঁয়াই নয় গণেশ চৌহান, সুরেশ চৌহান এবং দিলীপ চৌহান এই তিনটি পরিবারের ৬টি ঘরও তিনি নাকি কিনে নিয়েছেন বলে দাবি করে তাঁদের উঠে যেতে হুমকি দিয়েছেন। অন্যদিকে স্নানাগার বন্ধ করে দেওয়ার পর বেবি হিজড়ার দাবি তিনি আরও তিনটি ঘর কিনে নিয়েছেন। ঘরের মালিক সঞ্জু চৌহানকে ঘর ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

বনগাঁ স্টেশনে পাকিস্তানি মুদ্রাসহ গ্রেপ্তার দুই

গত ১৫ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানি মুদ্রাসহ দুই বাংলাদেশীকে রবিবার বনগাঁ স্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করলো রেল পুলিশ। তাদের নাম উসান আহমেদ এবং সুমন মিঁয়া। উসানের বাড়ি বাংলাদেশের সিলেট জেলায় আর সুমন মিঁয়ার বাড়ি সুনামগঞ্জে। তাদের কাছ থেকে আট হাজার পাকিস্তানি মুদ্রা এবং ১১ হাজার ৫০০ ভারতীয় টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের তিনটি সিম কার্ড ও একটি মোবাইল ফোন পাওয়া গিয়েছে। রেল পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা পেট্রোপোল সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকে বনগাঁ স্টেশনে এসেছিল। সেখান থেকে তাদের কলকাতায় আসার কথা ছিল। সেই সময়ে রেল পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে কয়েকজন ভারতীয়র নাম ও মোবাইল নম্বর পাওয়া যায়। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ তা গোপন রাখছে বলে জানায়।

এ বিষয়ে হিন্দু সংহতির নেতৃত্ব জানায়, দীর্ঘদিন ধরেই বনগাঁ ও তার সংলগ্ন বর্ডার অঞ্চল দুষ্কৃতিদের মুক্তাঞ্চল। এতদিন এই পথ দিয়ে ড্রাগস্, জাল টাকা, অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকছিল। এখন সরাসরি পাকিস্তান প্রেরিত জঙ্গিরা ভারতে ঢুকে পড়ছে। প্রশাসন যদি এ ব্যাপারে দ্রুত ও কড়া পদক্ষেপ না নেয় তাহলে আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের সামনে ভয়ঙ্কর বিপদ আসছে তা বলাই বাহুল্য।

হিন্দু প্রতিরোধকে আন্দোলনে রূপ দিতে হবে

তপন কুমার ঘোষ

হিন্দু সংহতির সাত বছর পূর্ণ হয়ে আট বছরে পড়ল। সফলভাবে উদ্‌যাপিত হল বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান কলকাতার ধর্মতলায়। জনসমাগম গতবারের থেকেও বেশি। রাণী রাসমণি রোডের তিনটি রাস্তাই ভরে গিয়েছিল। গতবার পর্যন্ত এই সমাগমকে বলেছি হিন্দু যুব সমাবেশ। কিন্তু এবার বলতে হচ্ছে জনসমাবেশ। বলতে যে খুব খুশি হচ্ছি তা নয়। গতবার পর্যন্ত আমাদের সমাবেশের ৯৫ শতাংশই থাকত শুধু যুবরা। এবার সেটা হয়েছে ৯০ শতাংশ। আর সাধারণ ১০ শতাংশ। এই ১০ শতাংশকে তো বাদ দেওয়া যায় না। তাই শুধু যুব সমাবেশ না বলে বলছি জনসমাবেশ। এর দুটো দিকই আছে। ভাল দিকটা হল—হিন্দু সংহতির আহ্বান ও কাজ সমাজের সাধারণ মানুষও আজ গ্রহণ করতে লেগেছে। অর্থাৎ যুব অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সার্বিক সমাজের স্বীকৃতি। এই সমাবেশের প্রস্তুতিপর্বেও এবার লক্ষ্য করেছি, যেন অনেকটা সহজ ও স্বাভাবিক। অনেকেই যেন অপেক্ষা করেই ছিল এই দিনটার জন্য—এদিন কলকাতায় আসতে হবে। কলকাতায় আসা, মিটিং-এ ভিড় করা—এটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল এই যোগদানের মাধ্যমে মুসলিম অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দু প্রতিরোধের আহ্বানকে স্বীকার করে নেওয়া। ঠিক এই জন্যই হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

হিন্দু সংহতির নামে গোটা রাজ্যব্যাপী একটা শক্তিশালী হিন্দু প্রতিরোধ গড়ে উঠুক, এটাই প্রত্যাশা। হিন্দু সংহতি নামে একটা শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠুক, এটা কাম্য নয়। হিন্দু সংহতি যদি একটা পাকাপোক্ত সংগঠনের রূপ নেয় তাহলে বোধ হয় এর উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। হিন্দু সংহতির ভূমিকা হওয়া উচিত অনেকটা পরাধীন ভারতের 'বন্দে মাতরম্'-এর মত। বন্দে মাতরম্ বলতে হলে কোন দলের সদস্য হতে হত না, কোন দল করতে হত না। শুধু দেশকে ভালোবাসা আর ইংরেজ বিরোধী মানসিকতাই যথেষ্ট ছিল। আর দরকার ছিল সাহস। যার অতটা সাহস নেই সেও একান্তে গোপনে বলত বন্দে মাতরম্। যার সাহস আছে সে জনসমক্ষে চিৎকার করে বলতে বন্দে মাতরম্। এই নিরীহ দুটি শব্দ ইংরেজের কাছে এতই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল যে, বৃটিশ সরকার আইন করে বন্দে মাতরম্ উচ্চারণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। স্কুল কলেজে বলা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। বন্দে মাতরম্ বলে কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার নাগপুরে স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন আর আমাদের বাংলার ছেলে সুশীল সেন আলিপুর আদালতে ১৫ ঘা বেত খেয়েছিলেন। এই বেত খাওয়ার পরেই বাংলার চারণ কবি গান লিখেছিলেন— 'বেত মেরে কি মা ভুলাবি, আমরা কি মা'র সেই ছেলে?'

সুজলা সুফলা অখণ্ড বাংলার দুই তৃতীয়াংশ থেকে বাঙালি হিন্দু অত্যাচারিত, অপমানিত ও বিতাড়িত। বাকি এই এক তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গেও বাঙালি হিন্দুর স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। তার অধিকার নেই, তার নিরাপত্তা নেই, তার মা-বোনের সম্ভ্রম রক্ষার কোন গ্যারান্টি নেই, তার জমি ও সম্পত্তি রক্ষার কোন গ্যারান্টি নেই, তার মঠ-মন্দির-ধর্মীয় অনুষ্ঠান, দেবোত্তর সম্পত্তি ও শ্মশানের জমি রক্ষারও কোন গ্যারান্টি নেই। এককথায়, শহরের হিন্দু বৈষম্যের শিকার আর গ্রামের হিন্দুর বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে নির্যাতনেরও শিকার। যাদের হাতে এই নির্যাতন তারা বাংলার হিন্দুদের উপর পাঁচশ বছর রাজত্ব করেছে, বলপ্রয়োগে লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে বাঙালি হিন্দুর হাত থেকে দুই তৃতীয়াংশ জমি কেড়ে নিয়ে বিতাড়িত করেছে। তারাই আবার এই বাংলায় অত্যাচারীর ভূমিকায়। অবশ্য দোষ তাদের একার নয়। তাদের অনুচর হয়ে কাজ করা হিন্দু এবং ভোটলোভী রাজনৈতিক দলগুলি তাদের এই অত্যাচারে পরিপূর্ণ মদত দিচ্ছে। একদিকে প্রগতিশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ভণ্ডামি করা বামপন্থীরা, আর একদিকে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলির জোটবদ্ধ মুসলিম ভোটের লোভ এবং মুসলমানদের অপরাধপ্রবণ শক্তির কাছে নতজানু প্রশাসন—এই তিনের যাঁতাকলে পড়ে গ্রামবাংলার হিন্দুর ধন-মান তো বটেই এমনকি অস্তিত্বও সংকটে পড়েছে। বহু বহু জায়গাতে হিন্দু সংখ্যালঘু হয়েছে। এমন কি বহু স্থান হিন্দুশূন্য হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলা ও শতাধিক ব্লকে আজ হিন্দু সংখ্যালঘু। অর্থাৎ পুনরায় আর এক পাকিস্তানের পটভূমি তৈরি হচ্ছে। যে অন্ধ সেই শুধু দেখতে পায় না এই পাকিস্তানের পূর্বাভাস, যে বধির একমাত্র সেই শুনতে পায় না এই পাকিস্তানের পদধ্বনি। আর হিন্দু বিদ্বেষী, ভণ্ড প্রগতিশীল সেকুরা ও বামপন্থীরা এটা স্বীকার করে না।

এই সপ্তরথীবেষ্টিত বাংলার হিন্দুকে কে বাঁচাবে? জানি না কে বাঁচাতে পারে। তবে কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন সংগঠনের একক ক্ষমতায় তা সম্ভব হবে না, সে দল বা সংগঠন যতই বড় বা শক্তিশালী হোক না কেন। এর জন্য গোটা পশ্চিমবাংলার সমস্ত হিন্দুকে এগিয়ে আসতে হবে, এই কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। এরজন্য প্রয়োজন গোটা রাজ্যব্যাপী একটা বিশাল আন্দোলন। দলীয় আন্দোলন নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আন্দোলন নয়, অস্তিত্ব ও আত্মরক্ষার আন্দোলন। এর পৃষ্ঠভূমিতে '৪৭-এর দেশভাগ, হিন্দু নির্যাতন ও হিন্দু বিতাড়ন তো আছেই। এর ভিত্তিতে থাকবে একটা ভাবনার প্রবাহ। স্বাভিমানের সঙ্গে বাঁচার একটা আকুতি। ভবিষ্যত প্রজন্মের নিরাপত্তা রক্ষার একটা তীব্র কামনা। এই আকুতি এই কামনাই পরাধীন ভারতের বন্দে মাতরমের মত কোন একটা প্রতীককে অবলম্বন করে বহুরূপে প্রকাশ পাবে জনগণের মধ্য থেকে। আজ এই পশ্চিবঙ্গকে বাঁচাতে, বাংলার হিন্দুকে বাঁচাতে হিন্দু সংহতি সেই সর্বজনস্পর্শী আন্দোলনরূপে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। বন্দে মাতরম্ ধ্বনি নিয়ে যেমন করে সেদিন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন সর্বস্পর্শী হয়েছিল, ঠিক তেমনি হিন্দু সংহতির নাম নিয়ে হিন্দু রক্ষার তীব্র ইচ্ছা ও মুসলিম অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দু প্রতিরোধের জোড়ালো সংকল্প গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়ুক—এই আশা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। বাংলার ৩৬ হাজার গ্রামে হিন্দু সংহতির দশ টাকার সদস্য হওয়া কর্মীরা থাকবে না, কিন্তু হিন্দু সংহতির নাম নিয়ে লড়াইতে এগিয়ে যাওয়ার মত প্রেরণা ও মনোবল যুবকরা পাবে—এটাই প্রত্যাশা। এবার ১৪ই ফেব্রুয়ারীর সমাবেশে ও তার প্রস্তুতিপর্বে এর আভাস আমি দেখতে পেয়েছি।

কিন্তু সব পূর্বাভাসই শেষ পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হয় না। তাই হিন্দু প্রতিরোধের আজকের এই পূর্বাভাসকে রাজ্যব্যাপী বাস্তবে পরিণত করতে হলে আরও অনেকটা রক্ত ও ঘাম ঝরাতে হবে; আরও অনেক মূল্য দিতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই কাজটা সংগঠনের দ্বারাই করতে হবে। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে সংগঠনের কাঠামোকে বেশি গুরুত্ব দিলে তা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে বলে আমি মনে করি। ২০১১ পূর্ব মমতা ব্যানার্জী সিপিএম বিরোধী কোন মজবুত সংগঠনের নেত্রী ছিলেন না। তিনি ছিলেন সিপিএম বিরোধিতার একটি প্রতীক। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত কোন গ্রামে যেখানে কোনদিন মমতা ব্যানার্জীর পা পড়ে নি এবং পড়বেও না, সেখানেও মানুষ সিপিএম-এর অত্যাচার ও দলবাজির বিরুদ্ধে লড়াইতে এগিয়ে গেছে শুধুমাত্র মমতার নাম নিয়ে। আমি জানি আজকের পরিস্থিতিতে মমতা ব্যানার্জীর উদাহরণ দেওয়া অনেকেরই ভালো লাগবে না। কিন্তু লোককে সন্তুষ্ট করা আমার কাজ নয়। জনগণকে সন্তুষ্ট করে ভোট পাওয়া যায়, তাদেরকে রক্ষা করা যায় না। তাই সমসাময়িক উদাহরণ হিসাবে মমতা ব্যানার্জীর নাম আমি নেবই। মমতা ব্যানার্জী সিপিএম-এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলেন নি, হয়তো পারেন নি। কিন্তু তাঁর জেদ, অদম্য সাহস ও সিপিএম বিরোধিতায় আন্তরিকতার জন্য তিনি সিপিএম-এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াইয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। ঠিক তেমনি হিন্দু সংহতিও যদি মুসলিম অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দুর আত্মরক্ষা ও আত্মসম্মান রক্ষার লড়াইয়ের একটা প্রতীক হয়ে উঠতে পারে তবেই একাজে সাফল্য আসবে। ইতিহাস থেকে আরও দুটো উদাহরণ নেওয়া যায়। ১৫ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যর ভক্তি আন্দোলন এবং গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহ (১৯৩০) ও ভারতছাড়ো (১৯৪২) আন্দোলন। এ দুটোই শক্ত সাংগঠনিক কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে ছিল না। একটা ভাবপ্রবাহ গোটা জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। বিহারের সব থেকে অনগ্রসর 'দোসাদ' এবং অন্যান্য জাতির মানুষের মধ্যেও গান্ধীবাবার স্বাধীনতা আন্দোলন এক আলোড়ন তুলেছিল।

তাই আমার ধারণা, শক্ত সাংগঠনিক পরিকাঠামো দিয়ে নয়, হিন্দুরক্ষার বার্তা নিয়ে হিন্দু প্রতিরোধকে আন্দোলনের আকারে রূপ দিতে হবে যা নিজের গতিতে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে। এইভাবে ইসলামিক আগ্রাসী শক্তিকে পরাস্ত করেই একমাত্র পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানো যেতে পারে। এছাড়া অন্য কোন পথ আমি দেখতে পাচ্ছি না।

বীরভূমের খড়মডাঙা গ্রামে 'ঘরে ফেরত' ধর্মান্তরকরণকে ঘিরে বিতর্ক

বীরভূমের রামপুর হাটের খড়মডাঙা গ্রামে শতাধিক খ্রিস্টান আদিবাসীকে হিন্দু ধর্মে পুনরায় ফিরিয়ে আনাকে ঘিরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বীরভূম জেলার তৃণমূলের নেতা অনুব্রত মণ্ডল বলেছেন ''আদিবাসীদের ধর্মান্তরণের জন্য বিজেপি লোভ দেখিয়েছে। বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তির সুযোগ দেওয়া ছাড়াও নানা ধরণের সুবিধা দেওয়া হবে বলে এই কাজটি করা হল। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বিজেপিরই অংশ। ভোটে সুবিধা লাভ করতেই এই কাজ করেছে।'' এই ধর্মান্তরণে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা প্রবীণ তোগাড়িয়া। আদিবাসীরা পুনরায় নিজ ধর্মে ফিরতে পেরে খুশি।

নৈহাটি সংঘর্ষে আহত গোপীপ্রসাদ মারা গেলেন

গত ১লা ফেব্রুয়ারী উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটি সংলগ্ন হাজিনগরে একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নেলসন রোডে আক্রান্ত হল হিন্দুদের গঙ্গা কলস শোভাযাত্রা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রাটি নেলসন রোডে ঢুকতে গেলে স্থানীয় মুসলিমরা তাতে বাধা দেয়। হিন্দুরা জোর করে ঢুকতে গেলে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। মুসলিম দুষ্কৃতিরা শোভাযাত্রার সঙ্গে আগত কিছু সন্ন্যাসীকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করে এবং হিন্দুদের কিছু দোকান ভাঙচুর করে। এর প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ হিন্দুরাও আজাদ হিন্দ ক্লাব নামে মুসলিমদের একটি স্থানীয় ক্লাব ভাঙচুর করে। উত্তেজনা সামাল দিতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও র‍্যাফ বাহিনী এলাকায় মোতায়েন করা হয়।

বিশাল সংখ্যক পুলিশ ও র‍্যাফের উপস্থিতি সত্ত্বেও পরদিন সকাল থেকে উত্তেজনার আঁচ বাড়তে থাকে। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, স্থানীয় মুসলিম দুষ্কৃতিরা ২রা ফেব্রুয়ারী সকাল থেকেই হিন্দুদের উপর চড়াও হয়। ধারালো অস্ত্র নিয়ে তারা পথচারীদের আক্রমণ করে। গোপীপ্রসাদ, পিতা রামেশ্বর প্রসাদ, সেই দুষ্কৃতিদের আক্রমণের ফলে মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং তাকে নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারী ঐ হাসপাতালেই গোপী প্রসাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, ২রা ফেব্রুয়ারী এই ঘনার সূত্রে নৈহাটি থানার পুলিশ অধিকর্তা সুবীর চক্রবর্তীর নির্দেশে দুটি এফ আই আর ৫৭/১৫ এবং ৫৮/১৫ দায়ের করা হয়। প্রথম এফআইএর-টির ভিত্তিতে পুলিশ ১৪ জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে আর দ্বিতীয় এফআইআর-টির ভিত্তিতে ২৩ জনকে গ্রেপ্তার করে যার মধ্যে ২১ জনই হিন্দু। যদিও ঘটনার মূল অভিযুক্ত পাপ্পু কুরেশী এখনও গ্রেপ্তার হয়নি।

দুটি এফআইআর-এর কপি হিন্দু সংহতির হস্তগত হয়েছে। এফআইআর থেকে ব্যাপাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীন নৈহাটি থানার পুলিশের পক্ষপাতমূলক এবং হিন্দু বিরোধী ভূমিকা সম্পূর্ণ স্পষ্ট। শুধুমাত্র হিন্দুদের প্রচুর সংখ্যায় গ্রেপ্তার করে, তাদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, তাদের প্রতিরোধ শক্তিকে ভেঙে দিতে প্রশাসন বদ্ধপরিকর। এই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রায়োগিক রূপ। এই ধারা চলতে থাকলে পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ ইসলামীকরণ ও আরেকটি পাকিস্তানে পরিণত হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

হিন্দু ধর্মাচরণে বাধা ঃ জল গড়াল হাইকোর্টে

মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশে মুসলিম মৌলবাদীরা হিন্দুদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে বাধা দিচ্ছে। স্কুলে সরস্বতী পুজোও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। ভারতের অন্তর্গত হলেও ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের জেরে মুর্শিদাবাদ জেলার জনবিন্যাস এখন পাল্টে গিয়েছে বলে অভিযোগ। সীমান্ত পার হয়ে প্রচুর লোক ঢুকে পড়ায় এখানে মুসলিম মৌলবাদীরা দাপট দেখাতে শুরু করেছে। কিছুদিন আগে একটি বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল যে, সংশ্লিষ্ট মৌলবাদীরা মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তবর্তী ব্লকগুলিতে তালিবানী শাসন কায়েম করতে উঠেপড়ে লেগেছে। হিন্দুদের লক্ষ্মী পুজো করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। স্কুলগুলিতে সরস্বতী পুজো করা যাবে না বলে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। এমনকী, সন্ধেবেলা হিন্দু বাড়িগুলিতে শাঁখ বাজালেও মোল্লারা এসে শাসিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। ফতোয়া না মানলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রটির প্রতিবেদন উল্লেখ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন আইনজীবী রমাপ্রসাদ সরকার। সংবিধানের ২৫, ২৬, ২৭ এবং ২৮ ধারা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে সবাই পছন্দমতো ধর্মাচরণ করতে পারে। তা হলে, মুর্শিদাবাদ জেলায় কেন এমন তালিবানী শাসন কায়েম হবে? কেন সংবিধানের নির্দেশ রক্ষা করতে প্রশাসন তৎপর হচ্ছে না? পুলিশ কেন হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে? প্রাথমিকভাবে মামলাটি গ্রহণ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর এ ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। পাশাপাশি, প্রধান বিচারপতি মুর্শিদাবাদের এসপি এবং জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন, হিন্দুদের ধর্মাচরণে যেন কেউ জোর করে বাধা না দেয় তা দেখতে।

ডায়মন্ড হারবার শহরে শিবমন্দির ভাঙলো মুসলিম দুষ্কৃতিরা

ডায়মন্ড হারবার পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড। সতপল্লী কলোনী পাড়া। প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো রক্ষাকালী মন্দির সংলগ্ন শিবমন্দির। পিছনের একটি জমি গোপনে বিক্রি হল মুসলিম সম্প্রদায়ের একজনের কাছে। এর পরে মূল সড়কের সাথে যোগাযোগের রাস্তা নিয়ে সমস্যা। মন্দির কমিটি এবং স্থানীয় হিন্দুদের দাবি, মন্দির থেকে কমপক্ষে দশ ফুট দূরে রাস্তা হোক। জমির মালিকের বক্তব্য মন্দিরের গা ঘেঁষে রাস্তা দিতে হবে। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর (নির্দল) মৌসুমী মৈত্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি দুই পক্ষকে নিয়ে বসে আলোচনা করে একটা সমাধান সূত্র বের করবেন। কিন্তু তিনি এই বৈঠক করার আগেই গতকাল ১৯শে জানুয়ারি ওই জমির মালিকসহ বহিরাগত মুসলমান দুষ্কৃতিরা একত্রিত হয়ে ওই শিবমন্দির ভেঙে দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা চরমে ওঠে। হিন্দু পুরুষরা কর্মসূত্রে এলাকার বাইরে থাকলেও মহিলারাই প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন। তারা দুজন দুষ্কৃতিকে ধরে ফেললেও বাকিরা পালিয়ে যায়। ধৃত দুজনকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হিন্দুদের শান্ত করার জন্য পুলিশ তখন সেই দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার করা হল বললেও পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বাহিনীর সাথে সাথে র‍্যাফ নামানো হয়।

স্থানীয় হিন্দুদের কথায় পুলিশ, প্রশাসন সহ বিভিন্ন দলের নেতারা এলাকায় গিয়ে দুষ্কৃতিদের সাথে সমঝোতা করে শান্তি বজায় রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন। জনৈক হিন্দু যুবকের কথায়, ''আমরা মন্দির ভাঙার বিচার চাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গ তুললেই পুলিশ, প্রশাসন এবং নেতারা একযোগে বিষয়টিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। সবাই রাস্তা দেওয়ার বিষয়টিকে নিয়েই আলোচনা করতে চাইছেন। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারটা সবাই এড়িয়ে যাচ্ছেন।''

বিজেপি-র ডায়মন্ড হারবার মন্ডল সভাপতি শ্রী মনোরঞ্জন কয়ালের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ''এ বিষয়ে আগামী বৃহস্পতিবার পৌরসভার মিটিং ডাকা হয়েছে। সেখানে আলোচনার মাধ্যমে এর সমাধান সূত্র খোঁজার চেষ্টা করা হবে।''

বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে স্থানীয় মুসলিমদের আগ্রাসী মনোভাব পরিস্থিতিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ, প্রশাসন যে কোন মূল্যে শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী। তাই মন্দির ভাঙার পরেও কোন কেস্ বা কেউ গ্রেপ্তার হলো না। শান্তি চাই, তা হিন্দুর আত্মসম্মানের বিনিময়ে হলেও। রাজনৈতিক নেতারা মুসলিমদের চটাতে রাজি নন। চরম অন্যায় করলেও সমঝোতা। এই এলাকার হিন্দুর 'আচ্ছে দিন' আদৌ আসবে কি না সেটা এখন প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল এই এলাকায় হিন্দুর পায়ের তলার মাটি আগামীদিনে বাঁচানো যাবে কি?

বীর শহীদদের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৪ বছর আগে লালু, পতিত, অনাদি, সুজিত এই চার কিশোর ভগবানের সঙ্গে মিশে গেছে। ছোটো হলেও তারা আজ আমাদের কাছে ভগবান। তাই তাদের প্রমাণ। ১৪ বছর আগে নিহত চার যুবকের প্রতি এভাবেই শ্রদ্ধা জানালেন হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ। ২০০১ সালে ১০ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় মুসলিমদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনাখালির চার যুবক। নৃশংসভাবে কানের পাশে গুলি করে খুন করা হয় তাদের। সেই খুনের প্রতিবাদে তপন ঘোষের নেতৃত্বে স্থানীয় হিন্দুদের জনরোষে উৎখাত হয়েছিল ১৭ ঘর মুসলিম পরিবার। যাদের বলিদানে সোনাখালির হিন্দুরা আজ স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার ফিরে পেয়েছেন, সেই চার যুবকের নামে গ্রামে স্থাপন করা হয়েছে মন্দির। সেই মন্দিরের ভিতর তৈরি শহীদ বেদীতে প্রতি বছর ১০ ফেব্রুয়ারি শ্রদ্ধা জানান এলাকার হিন্দুরা।

এবারও কয়েকশ হিন্দু মানুষ ১০ ফেব্রুয়ারি সোনাখালিতে ওই চার শহিদকে শ্রদ্ধা জানান। এই উপলক্ষে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল হিন্দু সংহতির কর্মীরা। ৭৫ জনের রক্তদানের কথা থাকলেও ব্লাডব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় সকলে রক্ত দিয়ে পারেননি। ব্লাডব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ৫৩ জনের রক্ত সংগ্রহ করেছে। প্রতি বছরের মত এবারও সোনাখালি গ্রামে শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন কুমার ঘোষ। শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাসন্তী রোডের উপর পালবাড়ি-তে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় তপন ঘোষ বলেন, ''আমি প্রত্যেক বছর এখানে এসেছি। লালু, পতিত, অনাদি, সুজিত ফুল হয়ে ভগবানের কাছে মিশে গেছে। ভগবানের পূজায় তাদের অর্পণ করা হয়েছে। আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই বলা হোক না কেন, আমি তাদের অর্পণ করেছিলাম। তাদের শহিদ হওয়ার জন্য আমি দায়ী। আমি তাদের এগিয়ে যাবার প্রেরণা দিয়েছিলাম। কিন্তু কোন পূজায় তাদের এগিয়ে দিয়েছিলাম? এখানে তখন হিন্দু সমাজের সম্মান, স্বাভিমান, মা-বোনের সম্ভ্রম রক্ষা হচ্ছিল না। সেদিনের লড়াইয়ে লালু, পতিত, অনাদি, সুজিতের সঙ্গে আরো অনেক যুবক এগিয়েছিল। তাদের মধ্যে হিন্দু সমাজের রক্ষায় রক্ত দিয়ে মূল্য দিতে হয়েছিল এই চারজনকে। কিন্তু এই ক্ষতির বিনিময়ে এলাকার হিন্দুরা আজ নিরাপত্তা ও আত্মসম্মান ফিরে পেয়েছে।

২০০১ সালে তপন ঘোষ আর এস এস-এর প্রচারক হিসাবে সোনাখালি এলাকায় কাজ করতেন। সেই সময় মুসলিমদের অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে জানান, ''হাসপাতাল মোড় থেকে ভাঙ্গনখালি পর্যন্ত আসতে ভীষণ নিরাপত্তার অভাব বোধ করতাম। ছোট ছোট মুসলিম ছেলেরা বৈষ্ণব সাধুকেও কটূক্তি করত। ধানের মন পিছু হিন্দুদের ট্যাক্স দিতে হত। সব মিলিয়ে এক দমবন্ধ করা অবস্থা ছিল। চার কিশোরের বলিদানের মাধ্যমে আজ এলাকায় হিন্দুরা নিরাপত্তা পেয়েছে। সভায় উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশ্যে তপন ঘোষ বলেন, ''ওই চার যুবক যে কারণে জীবন দিয়েছে, আমরা যদি সেই লড়াই এগিয়ে নিয়ে যাই তাহলে তাদের প্রতি সত্যি শ্রদ্ধা নিবেদন হবে। এই কাজে তিনি যুবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এই প্রসঙ্গে তপন ঘোষ পরিষ্কার জানিয়ে দেন, তার সঙ্গে বা তাঁর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সংহতির সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের যোগ নেই। যখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ছিল তখন সি পি এম, আর এস পি-র সাহায্য নিয়ে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছে মুসলমানেরা। আজ তারা টি এম সি-র ঝাণ্ডা ধরে অত্যাচার করছে। কাল হয়ত তাদের হাতে থাকবে বিজেপি-র ঝাণ্ডা। তার লক্ষণ এখন থেকেই দেখা যাচ্ছে। সুতরাং কোন রাজনৈতিক ঝাণ্ডা ধরেই হিন্দুরা বাঁচার পথ পাবে না। তিনি বলেন মুসলমানেরা রাজনৈতিক ভাবে নয়, আল্লার নামে এক হয়। সেইভাবে হিন্দু সংহতিরও লক্ষ্য—রাজনৈতিক ভাবে নয়, হিন্দুত্ববোধেই হিন্দুদের এক হতে হবে। তাহলেই আমরা মুসলিমদের জেহাদি কার্যকলাপ বন্ধ করতে পারব, মা-বোনের সম্মান রক্ষা করতে পারব, পায়ের নীচের মাটি বাঁচাতে পারব। সেই সঙ্গে হিন্দুধর্ম রক্ষা করতে পারব।

সভায় মানুষের প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্ট যে ১০ ফেব্রুয়ারি এই কর্মসূচী নিঃসন্দেহে এলাকার সাধারণ হিন্দুদেরকে উজ্জীবিত করে তুলল।

কবরস্থানের পাশে প্রস্রাব করার অভিযোগে মারধোর ও টাকা ছিনতাই

কবরস্থানের পাশে প্রস্রাব করার অপরাধে রাস্তায় বাইক থামিয়ে সাত হাজার টাকা ছিনতাই করে প্রচণ্ড মারধোর করা হয় এক হিন্দু যুবককে।

নদীয়া জেলার চাকদা থানার বেলেবাজার গ্রামের বাসিন্দা বাবু দাস এয়ারটেলের ডিশ টিভির কাজ করেন। গত ১১ই জানুয়ারি সন্ধ্যাবেলায় ডিশ ইনস্টলেশনের কাজ সেরে মদনপুর এলাকা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। কলতলা পাড়ার কাছাকাছি রাস্তার ধারে একটি ফাঁকা জায়গায় প্রস্রাব করার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালে জনৈক ব্যক্তি তাকে বলে যে সেটি কবরস্থান, সুতরাং প্রস্রাব করা নিষেধ। বাবু দাস ভুল স্বীকার করে বাড়ির দিকে রওনা হলে মারুতি ভ্যানে চেপে কিছু লোক তাকে ধাওয়া করে এবং প্রায় এক কিলোমিটার দূরে তাকে দাঁড় করায়। সেই ব্যক্তিরা তাকে কবরস্থানে প্রস্রাব করার অভিযোগে অকথ্য গালিগালাজ করে মারধোর করে ও টাকা ছিনতাই করে নেয়। বাবু দাসের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ''আমাকে কর্মসূত্রে প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে যেতে হয় তাই আমি পুলিশের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছি।''

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কে.এল.সি. থানার অন্তর্গত মৌসল গ্রামে গত ২৮শে ডিসেম্বর হিন্দু সংহতির উদ্যোগে এক বস্ত্রদান উৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রায় তিনশ জনের উপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মহিলা-পুরুষ ও বাচ্চাদের বস্ত্র দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ। সংহতির কর্মীরা বিশাল মিছিল করে শ্রী ঘোষকে মৌসল গ্রামে নিয়ে আসে। সেখানে বিভিন্ন বয়সী মানুষের মধ্যে কম্বল, শীতবস্ত্র এবং অন্যান্য পোশাক তুলে দেন সংহতি সভাপতি।

জোর করে বাড়ির সামনে সরকারি জমি দখলের অপচেষ্টা

রুখে দিল সুজাপুরের হিন্দুরা

হিন্দুর বাড়ির সামনের সরকারি জমি দখল করা। রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই হিন্দুর জমি সামনের দখলকারী মুসলমানের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হওয়া—সোজা কথায় গ্রামের একটি হিন্দু পরিবার উচ্ছেদ হল। একজন হিন্দু তার পায়ের তলার মাটি হারালো। এলাকা হিন্দুবিহীন হওয়ার পথে এক ধাপ এগিয়ে গেল। এই মডেল বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলকে হিন্দুশূন্য করার জন্য একটি সফল মডেল। কিছুদিন আগেই রায়দিঘিতে মুসলমানদের এই চেষ্টা রুখে দিয়েছিল ভগবতী হালদাররা। এবার দঃ ২৪ পরগণার ফলতা থানার সুজাপুরে ল্যান্ড জেহাদীদের রুখে দিল স্থানীয় হিন্দুরা।

১৯ জানুয়ারি সকাল ১০টা। সায়জুল সেখ, পাপ্পু সেখদের নেতৃত্বে দুষ্কৃতির দল সুজাপুর গ্রামের তাপস কটাল, সুশান্ত কটালদের বাড়ির সামনের সরকারি জমিতে ইঁটের দেওয়াল গাঁথতে শুরু করে। সূত্রের খবর এই সায়জুল সেখ বেলসিং ১নং-এর পঞ্চায়েত প্রধানের (টিএমসি) স্বামী। স্থানীয় হিন্দুরা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললে বচসা শুরু হয়। উত্তেজিত হিন্দুরা ইঁটের দেওয়াল ভেঙে ফেলে। খবর পেয়ে ফলতা থানার আই সি এবং এস ডি পি ও ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। উত্তেজিত হিন্দু জমায়েতকে ভেঙে দিতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

এখনও পর্যন্ত কোন অপরাধীর গ্রেপ্তার করার খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশ এবং রাজনৈতিক নেতারা আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে আগ্রহী।

লেডি আলকায়দাই লেডি আইএস

আলজিরিয়া, ইরাক থেকে ইয়েমেন ইসলামি জঙ্গি পণবন্দিকারীদের মুখে এখন একটাই নাম, আফিয়া সিদ্দিকি। পাকিস্তানের এই বিজ্ঞানী আফগানিস্তানে মার্কিন সেনার উপর হামলা চালানোর অভিযোগে আমেরিকার জেলে বন্দি।

সম্প্রতি মার্কিন সাংবাদিক জেমস ফোলিকে অপহরণ করে ৪২ বছরের আফিয়ার মুক্তির দাবি জানিয়েছিল আইএস। যদিও শেষ পর্যন্ত গত আগস্ট মাসে ফোলির মুণ্ডচ্ছেদ করে তারা। কিন্তু কে এই আফিয়া? জঙ্গিদের কাছে কেনই বা তাঁর গুরুত্ব? করাচিতে আফিয়ার পরিবার নিশ্চিত, তাদের মেয়ে নিরাপরাধ। গল্পটা বহুদিনের। ২০০৩ সালের মার্চে আল আয়দার তিন নম্বর মাথা এবং ৯/১১-এর অন্যতম এক চক্রী খালেদ শেখ মহম্মদকে গ্রেফতার করা হয় করাচি থেকে। তার পরই তিন সন্তানকে নিয়ে করাচি থেকে উধাও হয়ে যান আফিয়া। আলকায়দার সঙ্গে তিনি জড়িত বলে সন্দেহ ছিল গোয়েন্দাদের। মার্কিন অফিসারদের দাবি, প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে খালেদ শেখ মহম্মদের ভাইপোর সঙ্গে বিয়ে হয় আফিয়ার। ওসামা বিন লাদেনের জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত প্রথম মহিলার নাম বলতে উঠে এসেছিল অফিয়ার কথাই। যিনি লেডি আলকায়দা নামেই পরিচিত।

পাকিস্তান আর জামবিয়ায় শৈশব কাটিয়ে ১৮ বছরের আফিয়া চলে যান টেক্সাস। বস্টনের এমআইটি-তে পড়াশোনার পরে নিউরোসায়েন্স নিয়ে পি.এইচ.ডি. করেন ব্রান্দেইস ইউনিভার্সিটি থেকে। করাচির এক চিকিৎসকের সঙ্গে বিয়ে। ২০০১ সালে ইসলামি প্রতিষ্ঠানে ঢালাও অর্থসাহায্য করে এবং রাতচশমা-সহ যুদ্ধের উপর বই কিনে এফবিআই গোয়েন্দাদের নজরে আসেন আফিয়া আর তাঁর স্বামী। পরের বছর পাকিস্তানে

ফেরেন আফিয়া। বিচ্ছেদ হয় স্বামীর সঙ্গে। উধাও হয়ে গেলেও ২০০৮-এ তিনি ফিরে আসেন আফগানিস্তানে। সেখানকার গজনি প্রদেশ থেকে স্থানীয় পুলিশ গ্রেফতার করে তাঁকে। আমেরিকার আদালতের সূত্রে জানা যায়, ময়শ্চারাইজারের বোতলে দু'কিলো সোডিয়াম সায়ানাইড নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তাছাড়া, রাসায়নিক অস্ত্রের সাহায্যে নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিন ব্রিজ এবং এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ে হামলা চালানোর পরিকল্পনা সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্রও ছিল তাঁর কাছে।

এর পরে লেডি আলকায়দাকে জেরা শুরু করেন আফিগানিস্তানের মার্কিন সেনা। এই সময়েই একদিন জেরা চলাকালীন সেনার রাইফেল কেড়ে গুলি চালান আফিয়া। তার মুখে স্লোগান ছিল, ''আমেরিকার মৃত্যু হোক'', ''আমি আমেরিকানদের মারতে চাই।'' এর পর আফিয়াকে আমেরিকায় আনা হয়। সেনার উপরে হামলার অভিযোগে ২০১০-এ তাঁর ৮৬ বছরের কারাদণ্ড হয়। আফিয়ার বোনের একটাই দুঃখ, দিদি যদি জানতে পারে, ওকে নিয়ে এসব কথা হচ্ছে, শেষ হয়ে যাবে ও। কিন্তু লেডি আলকায়দা ফোলি-নিধনের পরে যে লেডি আইএস বলে জনপ্রিয় হচ্ছেন জঙ্গিমহলে, তা কি আফিয়ার বোন জানেন!

জেহাদী শক্তির মদতকারী

পবিত্র রায়

ইং ২১/১০/২০১৪ তারিখের সংবাদ পত্র মারফত জানলাম কবীর সুমন ও সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী সরকারী তদন্ত সংস্থাকে আক্রমণ করে বলেছে ''প্রতিটি মাদ্রাসায় তল্লাশি চালানো ঠিক হচ্ছে না। তদন্ত করতে যাওয়ার আগে তদন্তকারী অফিসারদের আগে তল্লাশি করা উচিৎ।'' জানি, এরপর বেশ কিছু ধর্ম নিরপেক্ষ বুদ্ধিবাজ কলমচিগণ, মানবাধিকার কর্মী সমাজকর্মী এঁরা সিদিকুল্লার সাথে 'পোঁ' ধরে মাঠে নেমে পড়বে। কেন্দ্রে সাম্প্রদায়িক বি.জে.পি. সরকার তথা মোদীজি প্রধানমন্ত্রী না হলে এই ভাবে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তল্লাশির নামে হেনস্থা তথা মুসলমানদের ছোট করা হতো না। রাজনৈতিক দলগুলিও বাদ থাকবে না। ববি হাকিম তো একবার বলেই দিয়েছেন, ''কেন্দ্রে সাম্প্রদায়িক সরকার তাই আহমেদ হাসান ইমরানকে অযথা ফাঁসানো হচ্ছে।'' এইবার তৃণমূল দলটি কি বলবে কে জানে, তবে খুব সম্ভবত বলবে ''ঢের হয়েছে, এই সব তল্লাশি বন্ধ করো, না হলে আমরাও ছেড়ে কথা বলবো না। আমরা এখনও মরে যাইনি, সেটা বুঝিয়ে দেব।'' বামপন্থীদের নেতা বিমান বসু মহাশয় হয়ত কিছু বলবেন না। সোজাসুজি আমেরিকার দোষ দিয়ে মুসলিম স্বার্থ রক্ষার ধর্ম নিরপেক্ষ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। বলবেন, ''চলছে না, চলবে না, ভেঙে দেব গুঁড়িয়ে দেব।'' কংগ্রেস দলটি খুব একটা কিছু বাংলায় করে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। ওদের কথা তাই বললাম না। সিদ্দিকুল্লার দল এটাও ঘোষণা করেছে যে আলিমাও রাজেরাকে তারা আইনী সহায়তা দেবে। সভার মধ্য হতে সঙ্গে সঙ্গে এক লক্ষ টাকাও চাঁদা উঠেছে (তথ্য সূত্র ঃ দি স্টেট ম্যান ২২/১০/২০১৪)

২২/১০/২০১৪ তারিখে বর্তমান পত্রিকার প্রথম পাতায় একটি সংবাদে বলা হয়েছে জেহাদীরা বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে বোধ হয়। সংবাদগুলি নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সবই একসূত্রে বাঁধা।

আমার প্রশ্ন হলো দেশের ভবিষ্যৎ কোন্ দিকে যাচ্ছে, আমাদের রাজনীতিকগণ কি কিছুই বুঝে না? আমার মতামত হলো ওঁরা সবই বোঝেন। তবে প্রশ্ন ওঠে সব জেনে শুনে ওরা এইমত ব্যবহার করছে কেন? উত্তর হলো মুসলমান ভোটের আশায়। বর্তমানে মুসলমান ভোট এর ইজারাদার হয়েছে জেহাদীগণ। জেহাদীগণ যেমন প্রচার করবে, ফতোয়া দেবে, মুসলমান ভোটও তেমনি ভাবেই একত্রীকরণ হবে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, যিনি বিগত বামফ্রন্ট সরকারের শেষ পর্বে দু'দুবারের জন্য পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, প্রথমবার ক্ষমতায় এসেই উনি বলেছিলেন, ''সীমান্ত এলাকার মাদ্রাসাগুলি জঙ্গি তৈরীর আখড়ায় পরিণত হয়েছে।'' তখন বামপন্থীদের চাপে, তথা বিমান বসু মহাশয়-এর সতর্কীকরণের ফলে উবাচটি বুদ্ধবাবুকে পুনরায় গিলতে হয়েছিলো। তসলিমা কাণ্ডে বুদ্ধদেব বাবু সেনা বাহিনী ডেকে ইদ্রিশ আলী ও মোল্লাতন্ত্রের বদমায়েশী বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। বাধ সেধেছিল সেই বামনাবতার বিমান বসু, ক্ষমতা যাওয়াতে যে বিমানের ডানা দুটি ভেঙেছে, বর্তমানে উড়তে আর পারে না। জমিতে থেকেই শুধু স্টার্ট এর শব্দে গোঁ গোঁ করে। পশ্চিমবাংলায় মুসলিম সন্ত্রাসীদের আশ্রয় স্থল বানানোর মূল মালিক হলো বামপন্থী দলগুলি। জ্যোতি বসু বলেছিলেন, ''এপারে বাংলা ওপারেও বাংলা, বর্ডার আবার কি?'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র জেহাদীদিগকে সার-জল সরবরাহ করছেন। সি পি এম তথা বামপন্থীগণ জেহাদী আশ্রয়স্থল বানিয়ে ওদের দ্বারা ক্ষমতা হতে বিতাড়িত হয়েছে, মমতা বন্দোপাধ্যায়ও ওদের পৃষ্ঠপোষকতা করে ক্ষমতা হতে বিদায় নেবে, নিয়তির পরিহাস এটাই।

আসল প্রশ্নের অবতারণায় প্রশ্ন করা যায় সিদ্দিকুল্লা, কবীর সুমনরা হঠাৎ করে তল্লাশির বিপরীতে কথা বলতে গেলেন কেন? তল্লাশিতে সমস্ত মুসলমান সমাজ বা ব্যক্তিগত পরিবারগতভাবে সিদ্দিকুল্লার তো কোন ক্ষতি হয় নি। ক্ষতিকর হচ্ছে শুধুমাত্র দেশ বিরোধী এবং জেহাদী মুসলমানদের। তাহলে এদের গাত্রদাহ হচ্ছে কেন? এরা কি জেহাদী সমর্থক? মমতা বন্দোপাধ্যায়ই বা কেন বললেন ''সমস্ত লোকজন একটি সম্প্রদায়কে কাঠ গড়ায় তুলছে''। কেউই তো কোন সম্প্রদায়কে দোষারোপ করেনি। তবে কি আমরা ধরতে পারি যে, মমতা, কবীর সুমন, সিদ্দিকুল্লী এরা বিচ্ছিন্ন কেউ নয়। এরা সবাই এক সুতোয় বাঁধা বর্তমানকালে বহু চর্চিত সন্ত্রাসবাদী বা জেহাদিদের 'স্লিপার সেল' কি একই? সন্দেহ কিন্তু প্রবল হতে প্রবলতর হচ্ছে।

সত্যিই যদি কেউ বিশেষ সেই সম্প্রদায়টিকে কাঠগড়ায় তোলে,তাহলে খুব দোষ দেওয়া যায় কি? কোন এক সভার মধ্যে আইনি সহায়তা দেবার জন্য যদি একলক্ষ টাকা নগদ পাওয়া যায়, তাহলে সেই সম্প্রদায়ের মানসিকতা সম্পর্কে সন্দেহ না করলে নিজেকে ক্ষমা করা যায় কি? সমস্ত মুসলমান সমাজ না চাইলেও ঐ সমাজের বৃহদাংশ তো চাইছে, না হলে জেহাদীগণ কোনভাবেই বাংলার মাটিতে ডেরা বাঁধতে পারতো না। অল্প কিছু মানুষ যদি জেহাদীদের সমর্থন নাও করেন, তাহলে সংখ্যা অত্যন্ত কম থাকার জন্য ওদের প্রতিপন্ন করা যায় না, যে ওরা জেহাদী সমর্থক নয়। আর সত্যিই কোন মুসলমান যদি জেহাদ সমর্থন না করে, তাহলে সে মুসলমান থাকে না। জেহাদীরা ওকে মুরতাদ বলে মুণ্ডচ্ছেদ করবে। ভয়ে, স্বেচ্ছায় বা যে কোনভাবেই হোক না কেন, প্রত্যেক মুসলমান জেহাদ সমর্থন করে। প্রতিটি ইসলাম ধর্ম সমর্থনকারী ব্যক্তিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে জেহাদী, হ্যাঁ, সরাসরি হোক আর অপ্রত্যক্ষই হোক না কেন ওরা সবাই জেহাদী।

সিদ্দিকুল্লাকে আমার প্রশ্ন, ''মাদ্রাসা কি তরবারি রাখার, বিস্ফোরক রাখার জায়গা? মাদ্রাসা কি জঙ্গি বানানোর ট্রেনিং এর জায়গা? আর এইরূপ মাদ্রাসাকে আপনি সমর্থন করেন কি?'' নিরাপত্তা বাহিনী বা তদন্তকারী দলকে তল্লাশি করতে হবে বলার অর্থ কি? ভবিষ্যতে আপনি কি বলতে চান যে বাইরে থেকে তদন্তকারী অফিসারগণ এইসব

শেষাংশ ৭ পাতায়

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বন্ধুটিয়া অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীরা তাদের কালীপুজোয় হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষকে আমন্ত্রণ জানায়। ঐ অঞ্চলের আশে-পাশে দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের উপদ্রবে সাধারণ হিদু অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বন্ধুটিয়ার অধিবাসীরা তাদের অভিযোগের কথা সংহতি সভাপতিকে জানায়। শ্রী তপন ঘোষ তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে এবং সমস্তরকম বদমায়েসির প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে নির্দেশ দেন। তিনি সব সময়ে তাদের পাশে থাকবেন বলে জানান।

বহুগামিতা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়—সুপ্রিম কোর্ট

যদিও শরিয়তি আইন (মুসলিমদের ব্যক্তিগত আইন) অনুযায়ী এক ব্যক্তির ৪ পত্নী স্বীকৃত, ৯ ফেব্রুয়ারী সোমবার সেই আইনকে কার্যত খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত সাফ জানাল বহুগামিতা মুসলিমদের মৌলিক অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়।

সোমবার বিচারপতি টি এস ঠাকুর ও বিচারপতি এ কে গোয়েলের নেতৃত্বাধীন একটি বেঞ্চ জানিয়েছে ‘‘সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি নিজ ধর্ম পালন ও তার বিস্তারে সচেষ্ট হতেই পারেন। একদিকে যেমন কারোর ধর্মীয় বিশ্বাসকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, তেমনই জনস্বার্থে শরীর ও সার্বিক নৈতিকতার বিরোধী কোন অভ্যাসের বিরোধিতা করাও প্রয়োজনীয়। বহুগামিতা ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় এবং আর্টিকল ২৫-এর ভিত্তিতেই একগামিতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল রাষ্ট্র।’’ কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম বহুগামিতাকে সমর্থন করলেও তাকে অনুমোদন করা যায় না।

প্রথম স্ত্রী অনুমতি ছাড়াই আর একটি বিয়ে করার জন্য কিছুদিন আগেই উত্তরপ্রদেশ সরকার তাদের এক কর্মচারীকে ছাঁটাই করেছিল। এর পরেই এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলাও দায়ের করা হয়।

সোমবার সেই মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারা ধর্মীয় বিশ্বাসকে রক্ষা করে, ধর্মীয় অনুশীলনকে নেয়। এই বিষয়ে বোম্বে, গুজরাত ও এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের সঙ্গে একমত পোষণ করেছে সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়েছে আর্টিকল ২৫-এর কোন অবমাননাই করেনি উত্তরপ্রদেশ সরকার।

উত্তরপ্রদেশের ইরিগেশন দফতরের এক আধিকারিক খুরশিদ আহমেদ খান প্রথম স্ত্রী সাবিনা বেগমের কোনওরকম অনুমতি ছাড়াই অঞ্জুম বেগম নামের এক মহিলাকে বিয়ে করেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর প্রথম স্ত্রীর বোন। মানবাধিকার কমিশন পুলিশকে এই বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন।

পুলিশ তাদের তদন্ত রিপোর্টে জানায়, প্রথম স্ত্রীর উপস্থিতি সত্ত্বেও সত্যিই দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন খুরশিদ। এরপরেই খুরশিদকে চাকরি থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয় উত্তরপ্রদেশ সরকার।

সরকারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন জানান খুরশিদ। কিন্তু হাইকোর্ট তাঁর আবেদন খারিজ করে দেন।

পরিকল্পিতভাবে মন্দিরে আক্রমণ সংখ্যালঘু দুষ্কৃতিদের

হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত নবাবপুরে দুষ্কৃতিদের আক্রমণে দুই ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। সেই সঙ্গে চলল যথেচ্ছাচার ভাবে হিন্দুর ধর্মীয় স্থানে আক্রমণ। আক্রমণকারীরা সকলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। নবাবপুরের এক স্থানীয় ব্যক্তির কথায়, প্রায়ই সংখ্যালঘুর গুণ্ডারা তাদের ধর্মীয় কাজে বাধা সৃষ্টি করে। এর পিছনে তাদের সম্প্রদায়ের হুগলী জেলার বড় মাথা আছে বলে তারা মনে করেন।

গত ১৯শে জানুয়ারী (সোমবার) নবাবপুরের পাল পাড়ায় গদাধর পালের বাড়ির পাশে কালীমন্দিরে অমাবস্যা উপলক্ষে কালীপূজা চলছিল। প্রতি অমাবস্যাতেই সেখানে পূজা হয় এবং সকাল সন্ধ্যায় মাইকে মায়ের গান হয়। এবার পূজার দিন রাত ৯টা থেকে সাড়ে নয়টার মধ্যে মেটে খালের পূর্ব দিকের বাসিন্দা কিছু সংখ্যালঘু যুবক যাদের মধ্যে আজিজুর (পিতা নাম জানা যায়নি), আসরাফ আলি (পিতা ইমতাজ আলি), ইনসান আলি মল্লিক (পিতা সওগত আলি মল্লিক), জাহাঙ্গীর রহমান (পিতা -মুজিবর রহমান), ছোট মল্লিক (পিতা হানিফ মল্লিক), সেখ জব্বার (পিতা- মৃত সেখ রহমান), এবং আরো অনেকে জড়ো হয়ে বলতে থাকে, তোরা এখুনি মাইক বন্ধ কর, নইলে তোদের প্রাণে মেরে ফেলবো। হুমকিকে উপেক্ষা করলে দুষ্কৃতিরা মন্দির লক্ষ্য করে ইঁট-পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে অশ্রাব্য ভাষায় হিন্দু ও তার দেব-দেবীদের নিয়ে গালিগালাজ করছিল। ইঁটের আঘাতে গৌর মোহন পাল নামক এক ব্যক্তি মাথায় গুরুতর আঘাত পায়। তার মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে। মৌসুমী পাল নামক এক মহিলাও পায়ে আঘাত পায়। আকস্মিক এই আক্রমণে হিন্দুরা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। চেঁচামেচি শুনে পাড়ার সকলে বেরিয়ে আসে এবং আক্রমণকারীদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করে। গৌরমোহন ও মৌসুমীকে স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করতে নিয়ে যায়। ইঁট পাথরের আঘাতে মন্দির ক্ষতিগ্রস্থ ও পুরোহিত সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়।

এই আক্রমণের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতিদের নামে চণ্ডীতলা থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে প্রথমে তারা অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। পরে হিন্দু সংহতির চাপে থানা একটি এফ. আই. আর. দায়ের করে । এফ.আই.আর নং- ২৬/১৫। ৩২৩, ৩২৫, ৩০৭ নং ধারায় কেস দায়ের হয়েছে দুষ্কৃতিদের নামে।

পূর্ব প্রকাশিতের পর

লাভ জেহাদের আদ্যোপান্ত ঃ মহসিনা খাতুন

...আসলে মেয়েটির পূর্বজীবনে ফিরে যাওয়ার মানসিকতা নষ্ট হওয়ার একটা অন্যদিকও আছে। এভাবে মেয়েটি পালিয়ে আসার পর মেয়েটিকে আর মেয়ের বাড়ির আত্মীয়রাও মেনে নেয় না। অনেক ক্ষেত্রে তারা পরিচিত মহলে রীতিমত ঘোষণা দেয় এই বলে যে, তাদের মেয়ে মারা গেছে। কিম্বা অনেক সময় দেখা যায় যে, মেয়েটির দাদা বাবা বা নিকট আত্মীয়রা বলে যে, ওই মেয়েকে দেখলে তারা মেরে ফেলবে। সেক্ষেত্রে ফিরে আসতে চাইলেও মেয়েটির ফিরে আসার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আক্রান্ত দুর্বল মেয়েটিকে হত্যার হুমকি না দিয়ে, দুষ্কৃতিকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তা তারা করে না। কারণ? মুসলিমদের আক্রমণাত্মক মানসিকতার প্রতি ভয়। তাই হাস্যকর ভাবে নিজেদের আত্মীয় আক্রান্ত দুর্বল মেয়েটিকে হত্যার হুমকি দিয়ে আপন পৌরুষ জাহির করতে চায়। কিন্তু এভাবে পারিবারিক সম্মানের জন্য হত্যা বা হত্যার চেষ্টা কাপুরুষোচিত অপরাধ তো বটেই, তার উপর, এই কাজের কোনও প্রভাব জেহাদিদের উপর পড়ে না।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। ঘটনাটি আমাকে রীতিমত আহত করেছিল। মুর্শিদাবাদের এরকম এক উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের বাবা গর্ব করে বলেছিল, ‘‘আমরা ভেবে নিয়েছি ও মরে গেছে। গঙ্গাতীরে ওর শ্রাদ্ধ করে এসেছি নিজে হাতে।’’ আমি বললাম, কিন্তু মেয়েটি তো সত্যিই মারা যায় নি, আপনি ওর শ্রাদ্ধ করলেন। উনি মেজাজ হারিয়ে চিৎকার করে উঠলেন- ‘‘ ও মরে গেছে। ওর ব্যাপারে আর কিছু জানি না।’’ খোঁজ নিয়ে দেখলাম কুড়ি - বাইশ বছরের সেই মেয়েটি দুই সন্তান নিয়ে ওই বাড়ি থেকে মাইল দেড়েক দূরে একটি ঝুপড়িতে থাকে। পরের বাড়িতে ঝি-গিরি করে ছেলে মেয়েদের খুদকুঁড়ো খাওয়ায়। জিজ্ঞেস করায় বললে, ‘‘সব আমার কপাল গো দিদি! কি কুক্ষণে সেদিন বাড়ি ছেড়েছিলাম। আজ বাবাকে বাবা বলতে পারি না, মাকে মা বলতে পরি না, ভাইকে ভাই বলতে পারি না। আমি তো এখন মুসলমান। ফিরতে তো চেয়েছিলাম। কিন্তু কেউ ফিরিয়ে নিল না। সব কপাল! সব কপাল!’’ মেয়েটির কথাগুলো শুনছিলাম কিন্তু তার চোখের তাকাতে পারছিলাম না। অবশেষে তাকিয়ে দেখি এত কষ্ট সত্ত্বেও মেয়েটির চোখে জল নেই। কাঁদতে কাঁদতে আজ মনে হয় ওর সমস্ত কান্না শেষ হয়ে গেছে। আমার শুধুই মনে হচ্ছিল, মেয়েটি তো ওরই মেয়ে। ওরা সংসারে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আছে, আর নিজের মেয়ে যে কিভাবে বেঁচে আছে, তা দেখছে না! আশ্চর্য মানুষ! মেয়েটি যখন আপন ধর্মে ফিরতে চাইছে, তখন ফিরিয়ে নেওয়া উচিত। যাই হোক, এটাও একটা কারণ মেয়েটির ইচ্ছে থাকলেও ফিরে আসতে না পারার।

অনেক সময় আবার অন্য ঘটনাও ঘটে। হয়ত মেয়েটির বাড়ি থেকে হয়তো ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু মেয়েটিকে ততদিনে সম্পূর্ণ বশীভূত করে ফেলা হয়েছে। মায়ের আঙুল কেটে গেলে যে মেয়ে সারা রাত কাঁদত, মা তার পায়ে ধরে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও তার ভাবান্তর হয় না। তার মধ্যে এতটাই পরিবর্তন আসে। সে যাই হোক, লাভ জেহাদে আক্রান্ত মেয়েদের পরিণতি ঠিক কি হয়, এবার সেই দিকে একটু আলোকপাত প্রয়োজন। চারটি সম্ভাব্য পরিণতির কথা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো।

(১) সাধারণ আর পাঁচটা মুসলিম মেয়ের মতো নিরাপত্তাহীন হয়ে, পতির কৃতদাস হয়ে, কষ্ট বুকে চেপে রেখে, হাসিমুখে জীবন কাটানো। (কতখানি কৃতদাসের মতো থাকতে হয় মুসলিম গৃহবধূদের, জানতে পারা যায় কঙ্কর সিংহ, রবিন্দ্রনাথ দত্ত, সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তসলিমা নাসরিন, হুমায়ুন আজাদ, সুহাস মজুমদার, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী এবং আরও অনেকের বই থেকে। দুই একটি বইতে এমন ঘটনার উল্লেখ আছে যে, অমুসলিম মেয়েদের ঘরে ঢুকিয়ে তাদের উপর নারকীয় নির্যাতন চালাচ্ছে কোন মুসলিম, তাদেরই বউ তখন বাড়ির দরজা আগলাচ্ছে, যেন পুলিশ ঘরে ঢুকতে না পারে।) সঙ্গে আরও একটি কাজ তাদের দেওয়া হয়, তা হল, পরিচিত গন্ডীর অমুসলিম মেয়েদের মুসলিম পুরুষকে বিবাহ করতে উৎসাহিত করা।

(২) স্বামীর অন্য স্ত্রীর বা স্ত্রীদের সাথে একসাথে চুলোচুলি করে থাকা। পরবর্তী স্ত্রী মুসলিম হলে বাড়ির অন্যদের কাছে সে বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে লড়াইটা অসম হয়ে ওঠে। ফলে হয় সব সহ্য করে ঘরের এক কোণে পড়ে থাকা বা পতি-পরিত্যক্তা হয়ে বাপের বাড়িতে সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া বা আর পতির অপেক্ষা করা। একদিন এক পতি-পরিত্যক্তা মুসলিম মহিলাকে পতি কখনো খোঁজ নিতে আসে কিনা জিজ্ঞেস করায় তার ব্যঙ্গ ভরা উত্তর ছিল —‘‘আসেই না এমনটা অবশ্য নয়! বউ-র সাথে এক একদিন একঘয়ে লাগলে কিম্বা তার সাথে ঝগড়া হলে চুপি চুপি এসে রাতের খিদেটা মিটিয়ে সকালে ছেলেটাকে বাবা বাছা করে একটা দশটাকার নোট হাতে ধরিয়ে চলে যায়।’’ শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদেই পতি পরিত্যক্তার সংখ্যা তিন লাখের উপর!!

(৩) তালাক। তালাক হলে তাদের পতিগৃহে স্থান হয় না, আর, নিজগৃহে ফিরে আসাও দুষ্কর হয়ে পড়ে। ফলে অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে ঠিকে ঝিয়ের কাজ কিংবা দেহব্যবসা। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা এবং কলকাতায় এমন অনেক দেহ- ব্যবসায়ী দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে কাজের লোভ দেখিয়ে তাদের অন্য রাজ্যে পাচার করা হয়, তাদের লাগানো হয় দেহ ব্যবসায়। অবার কখনো কখনো বিদেশে, বিশেষত মধ্যপাচ্যের দেশগুলিতে পাচার করা হয় তাদের। আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের পাল্লায় পড়ে নিখোঁজ হয়ে যায় এরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের আরব দেশগুলোতে, কোন অভিজাত ধনী মুসলিমের বাড়িতে রাঁধুনির পরিচয়ে (আসলে যৌনদাসী করে) রাখা হয়।

(৪) আরেকটি হল সন্ত্রাসবাদের কাজে লাগানো। বিশেষত সন্ত্রাসবাদের কাজে লাগানো। বিশেষত সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার কাজে।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, সাধারণত এদের পরিণতি সুখকর নয়। অতি নগণ্য কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া মেয়েটির জীবন নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত।

ভারতের মত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এমন ভাবে পরিকল্পিত ধর্মান্তর চলতে দেওয়া উচিত না। কেননা, স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর ব্যতীত ধর্মান্তরকে ‘রাজনৈতিক হিংসা’ হিসাবেই দেখা হয়। লাভ জেহাদ আসলে মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে করা রাজনৈতিক হিংসা, যাকে সহজেই দাঙ্গার সমকক্ষ বলা যেতে পারে। আর এই ধরণের রাজনৈতিক হিংসা কোন দেশের ধর্মভিত্তিক জনবিন্যাসকে এমনভাবে পালটে ফেলবে, যা অদূর ভবিষ্যতে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়ে উঠবে। তাই আমাদের মতো প্রতিটি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবাসীর প্রয়োজন এই ধরনের সমস্যার বাস্তব সমাধানের কথা চিন্তা করা।

(ক্রমশঃ....)

স্কুলে জলসা করা নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা, বোমাবাজি

গত ১৬ ফেব্রুয়ারী মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার অন্তর্গত বৈষ্ণবনগর হাইস্কুলে জলসা করাকে নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো। স্কুল বন্ধ রেখে জলসা করাকে কেন্দ্র করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মারামারি হয়। চলে ব্যাপক বোমাবাজি। যদিও হতাহতের কোন খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশ এই ঘটনায় ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

সূত্রে খবর, বৈষ্ণবনগর হাইস্কুলে সোমবার (১৬/২) ক্লাস হচ্ছিল। হঠাৎ বিনা নোটিশেই ঘোষণা করা হয় যে ইসলামিক জলসার জন্য বেলা ১২টার পর স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। প্রসঙ্গতঃ বৈষ্ণবনগর হাইস্কুলটি সম্পূর্ণ হিন্দু প্রধান অঞ্চলে, তবে বেশ কিছু দূরের মুসলমান গ্রাম থেকে কয়েকজন ছেলে এই স্কুলে পড়তে আসে। সপ্তাহের প্রথম স্কুলের দিনে হঠাৎ করে স্কুল বন্ধ করে মিলাতের জলসা করা হেডমাস্টার অংশুমান ঝা-র এতটুকু ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু স্কুলের সেক্রেটারি জিহাদুল সেখ-এর চাপে স্কুল ছুটি ঘোষণা করতে বাধ্য হন। বাইরে থেকে অনেক মুসলমানও স্কুল প্রাঙ্গণে জড় হয়েছিল। তখন স্কুলের ছাত্ররা এই জলসার প্রতিবাদ করতে থাকে। স্কুল বন্ধ করে ধর্মীয় জলসা তারা মানতে রাজি হয়নি। একাদশ শ্রেণির ছাত্র প্রসেনজিৎ চৌধুরী ছাত্রদের হয়ে বলতে গেলে বহিরাগত মুসলমানরা তাকে মারধোর করে। প্রসেনজিৎ তখন পাড়ায় গিয়ে সমস্ত কথা বললে তার বাড়ির লোকজন ও পাড়ার যুবকেরা স্কুলে এসে এই ঘটনার প্রতিবাদ করে। ফলে মুসলমানদের সঙ্গে বচসা বাঁধে, শেষে তা মারামারিতে পরিণত হয়। হিন্দুদের হাতে মার খেয়ে তারা পালায়। সকলে ভেবেছিল ঘটনাটা এখানেই মিটে গেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে চার-পাঁচশো সংখ্যালঘু স্কুলের সামনে ব্যাপক বোমাবাজি করে। স্কুলে ছোট ছোট পড়ুয়াদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। তাদের হস্তক্ষেপে কিছুক্ষণের মধ্যে উত্তপ্ত পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে।

এরপরেই শুরু হয় রাজনৈতিক খেল। সম্প্রদায়গত প্রশ্ন এলে সংখ্যালঘু রাজনীতিকরা আর পার্টি কালার দেখে না, তা আবার প্রমাণ করলো মালদার বৈষ্ণবনগর স্কুলের ঘটনা। অঞ্চলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সিপিএম-এর সরিয়াতুল ইসলাম, কংগ্রেসের এম.এল.এ.. ঈশা খান চৌধুরী এবং টিএমসি-র ছেলানউদ্দিন আহমেদের চাপে পুলিশ ৮ জন হিন্দু এবং ১ জন মুসলিমকে গ্রেপ্তার করে। আক্রমণকারীদের ছেড়ে আক্রান্তদের ধরায় এলাকার মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। পরে অবশ্য পুলিশ ৭ জন হিন্দুকে ছেড়ে দেয়। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ থেকে ১৪৪ ধারা করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিন কিলোমিটার দূরে গোপালপুর ভাগজান গ্রামের থেকে সন্ধ্যো সাতটা নাগাদ তিনজন হিন্দু ছেলেকে তুলে নিয়ে যায়। তাদের আক্রমণে বেশ কয়েকটি বাড়ির টালি ভাঙে। হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর প্রতিবাদ করলে তিনজন ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

কেরালায় গণিকালয় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের জন্য

কেরলের এর্নাকুলাম জেলায় পেরুম্ভাবুর হল এমন একটি শহর যেখানে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী শ্রমিকদের ঘন বসতি। এই শ্রমিকদের শারীরিক চাহিদা মেটানোর জন্য এই শহরে পাঁচটি পতিতালয়ে রম রম করে দেহব্যবসা চলছে। এসবগুলিই স্থানীয় মালায়ালী লোকদের দ্বারা চালিত হচ্ছে।

এই জেলার কুন্নাথুনাদু মহকুমায় ৫৬৫-টি প্লাইউড ও ভিনিয়ার কারখানা আছে। এছাড়া অনেক রাইস মিল, পাথরভাঙা ও বিভিন্ন ধাতুর কারখানা আছে। এগুলির অধিকাংশ শ্রমিকই বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারী। এদের সংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এদের অধিকাংশই ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে বয়স। এই সস্তা শ্রমিকদেরকে রাখার জন্য কারখানা মালিকদের স্বার্থ আছে। তাই এই মালিকদের নিয়োজিত একটি বড় মাফিয়া চক্র এই শ্রমিকদেরকে পতিতালয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করে। এই মাফিয়া চক্রকে মদত দেয় ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠী।

এই পতিতালয়গুলি শুধুমাত্র অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য, তাই স্থানীয় মালয়ালিদের এই জায়গাগুলিতে আসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি যেহেতু এই বাংলাদেশী শ্রমিকদের উপর নির্ভর করে চলছে তাই ব্যবসায়ীরাও এদের গণিকালয়ে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে। পুলিশও এই বিষয়ে সব জেনেও অন্ধ সেজে রয়েছে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, পতিতালয় পরিচালনাকারীরা মাসিক ১৫০০০ বা ২০০০০ টাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। যে সমস্ত খদ্দের নিয়মিত যায় তাদের থেকে প্রতিবার ৩০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা নেওয়া হয়। তবে রবিবার ব্যস্ততম দিন বলে সেদিন রেট বেশি।

৫ পাতার শেষাংশ

জেহাদী শক্তির মদতকারী

গোলা-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র সংগে করে নিয়ে গিয়েছিলো, আর অন্যায় ভাবে দোষ দেওয়া হচ্ছে মুসলমানদিগকে?" কথার প্রতিধ্বনি তো তেমনই মনে হচ্ছে।

মনে রাখবেন মুসলমান মুসলমান, জেহাদ জেহাদ খেলা খুব একটা ভাল কাজ নয়। ভারতবর্ষের মোটামুটি আশি শতাংশ মানুষ এখনও অমুসলিম। এরা কিন্তু হিন্দু হিন্দু খেলা শুরু করতে পারে। সে খেলার ফল মোটেও সুখকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে না। সোরাবর্দীর হাতে শাসনব্যবস্থা বাংলায়। ভারত বৃটিশদের হাতে, এমতাবস্থায় কোলকাতায় দু'দিন মার খাওয়ার পর হিন্দুরা যেটা প্রয়োগ করেছিলেন, মুসলামনগণ এখনও সেটা মনে রাখতে বাধ্য হয়েছে। বিহার দাঙ্গাও মনে রাখার মত, গুজরাট কাণ্ডটি না হয় উহ্যই রাখলাম।

বর্তমানে বহু হিন্দু যুবককে বলতে শুনেছি "ওরা বেশ রেডি হয়েই আছে" আমাদেরও রেডি হতে হবে। অর্থাৎ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, পরিণতিতে অবশ্যই গড়াবে। বার বার অনুরোধ করছি মুসলমান তোষণকারীগণ মুখে লাগান পরান। এক পক্ষকে তোষণ করলে অন্য পক্ষ নিজেদের রাস্তা বেছে নেয়। এক পক্ষকে অন্যায় কাজে মদত দিলে অন্য পক্ষ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে অন্যায় কাজে মন দেবে। পরিণাম ফল বড় ভয়ংকর। সিদ্দিকুল্লাকে স্মরণ করাতে চাই, "এটা চৌদ্দশত হিজরী চলছে।" মোহাম্মদ সত্যিই একজন মহামানব, তাঁর কথা মিথ্যা হবে না। সুস্থ এবং সুষ্ঠ রাস্তায় চললে কিছু বেশীদিন টেকানো যেতে পারে মাত্র।

পরিশেষে একটা কথা বলতে চাই। কথাটি হলো প্রকারান্তরে দেশ বিরোধী শক্তিকে মদতদানকারী কথা বলে, আইনি সহায়তা দেবার নাম করে জেহাদীদের সাহায্য করার কথা বলে সিদ্দিকুল্লা ও সুমন (কবীর সুমন) কি রাষ্ট্রদ্রোহিতা করে নি? ব্যক্তিগত মত প্রকাশ-এর স্বাধীনতা সবারই আছে। তবে সেটা যেন জাতীয়, সামাজিক বা কোন অন্যায় -এর পক্ষে না হয়। আপনাদের মতামত কিন্তু জাতীয়, ধর্মীয়, সামাজিক ও জনস্বার্থের পরিপন্থী। সুতরাং আপনাদের গ্রেপ্তার করা হবে না কেন?

কুমড়োখালিতে শান্তি নেই, আদিবাসী যুবক গুলিবিদ্ধ

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী দুপুরে দু পক্ষের গুলি-বোমার লড়াইয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বাসন্তী থানার ৯নং কুমড়োখালি গ্রাম। একটি সম্পত্তি বিবাদের সূত্র ধরে একদল দুষ্কৃতি পার্শ্ববর্তী সন্দেশখালি থানার রামপুর বাজার থেকে ধাওয়া করে আসে ঐ গ্রামে। ঐ গ্রামের শ্মশানে পড়তে থাকে যথেচ্ছভাবে বোমা ও চলতে থাকে গুলি। দুপক্ষই টিনের ও বাঁশের ঢাল নিয়ে এই বোমাগুলির লড়াই চালাচ্ছিল বলে জানা যায়। কাছেই থাকা বাসন্তী থানার পুলিশ কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি চালায়। ঐ লড়াইয়ের মাঝখানে পড়ে যায় আদিবাসী যুবক সমীর সরদার। তার কোমরে গুলি লাগে। গুরুতর জখম অবস্থায় পুলিশ তাকে তুলে ক্যানিং হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কলকাতার পি.জি. হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। পুলিশ দুপক্ষের নামেই কেস রুজু করেছে। কেস নং বাসন্তী ১০৯/১৫ এবং ১১০/১৫।

স্থানীয়দের বিবরণ অনুসারে, এই ৯নং কুমড়োখালি গ্রাম চড়াবিদ্যা অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। এই অঞ্চল থেকে বহু মানুষ পার্শ্ববর্তী সন্দেশখালির কুখ্যাত সাজাহান শেখের হুমকিকে অগ্রাহ্য করে গত ১৪ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় হিন্দু সংহতির জনসভায় যোগ দেওয়ায় ঐ অঞ্চলের হিন্দুরা সাজাহান শেখের আক্রোশের শিকার। তারই পরিণতিতে এই আক্রমণ।

এবার উস্তি বাজার লুট হয়ে গেল

এবার লুট হল দঃ ২৪ পরগণার উস্তি বাজার। তারিখ ২৭ জানুয়ারী। একটু ভুল হল। এই দিন শুধু হিন্দু দোকানগুলি লুট হল উস্তি বাজারে। একটি দোকানে কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে অতি ক্ষুদ্র একটি বিবাদকে পরিকল্পিতভাবে বড় করে কয়েকশ মুসলিম দুষ্কৃতি ঝাঁপিয়ে পড়ল উস্তি বাজারে হিন্দু দোকানগুলির উপর। উস্তি ব্লকে সংখ্যালঘু হিন্দুরা কোনো প্রতিরোধের কথা ভাবতেই পারে না। কাছেই থানা খবর পেয়ে পুলিশ এসে লুটপাট থামানোর চেষ্টা করল, কিন্তু ততক্ষণে এসে পৌঁছে গেলেন রাজ্যের মন্ত্রী এবং স্থানীয় এম.এল.এ. গিয়াসউদ্দিন মোল্লা। তিনি এসেই পুলেশর ওপর চোটপাঠ শুরু করে দিলেন। ডায়মন্ডহারবার এস.ডি.পি.ও.-র

সঙ্গে তার প্রচণ্ড কথা কাটাকাটি হল। স্থানীয় সংবাদ সূত্রে জানা যায় যে, মন্ত্রীর তিরস্কারের ফলে পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। তখন সেই মন্ত্রীর উপস্থিতিতে অবাধে চলল লুটপাট। হিন্দু সব্জীওয়ালা ও ফলওয়ালাদের সমস্ত জিনিস ফেলে দিল দুষ্কৃতিরা। নবীন পালের অন্নপূর্ণা বস্ত্রালয় থেকে কয়েক লক্ষ টাকার কাপড় ও ক্যাশ লুট হয়ে গেল। কৃষ্ণ মণ্ডলের টি.ভি. দোকান থেকে এক ডজন এল.সি.ডি. লুট হয়ে গেল। সহদেব ঘোষের ভূষিমালের দোকান, আশিষ মন্ডলের নারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, মাকালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, পরিমল পালের সাইকেল দোকান সহ প্রায় ৬০টি হিন্দু দোকান লুট হল ও ভাঙচুর হল। পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হল অনেক দোকান। মোট ক্ষতির পরিমাণ ১ কোটি টাকারও বেশি।

আক্রমণকারী দুষ্কৃতিদের নেতৃত্ব দিয়েছিল আজিজুল সরদার ওরফে কালো, ওবেদুর রহমান ওরফে লিটন, রউফ বৈদ্য, এমাদুল সরদার, ইউনুস গাজী, সিরাজুল বৈদ্য প্রভৃতি দুষ্কৃতকারীগণ। লুটের সময় দুষ্কৃতিরা মুড়িমুড়কির মত বোমা ও গুলি ছুড়ছিল। পুলিশও শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলি করে। এ পর্যন্ত পুলিশ ১৯ জন মুসলিম এবং ৬ জন হিন্দুকে গ্রেফতার করেছে। আরো ১৫ জন হিন্দুর বিরুদ্ধে কেস থাকায় তারা বাড়ি থেকে পলাতক।

দশ বছরে দেশে মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে ২৪ শতাংশ, তথ্য সেনসাসে

২০০১-২০১১-র মধ্যে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ২৪ শতাংশ বেড়েছে। উল্লেখ্য, এই পর্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জাতীয় গড় ১৮ শতাংশ। এর অর্থই হল, এই দশকে হিন্দুর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৮ শতাংশেরও কম।২০০১-এ দেশের মোট জনসংখ্যার ১৩.৪ শতাংশ ছিল মুসলিম। কিন্তু গত ১০ বছরে তা প্রায় ০.৮ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৪.২ শতাংশ। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে (৬৮.৩ শতাংশ)। এরপরই রয়েছে অসম (৩৪.২ শতাংশ)। তৃতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা সংক্রান্ত সেনসাস রিপোর্টে এই তথ্য জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, অসম ও পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের সমস্যা দীর্ঘদিনের। তার চাপেই এই দুই রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যায় বৃদ্ধি ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

১৯৯১-২০০১-এ দেশে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৯ শতাংশ। ২০০১-২০১১ পর্বে তা ২৪ শতাংশ। জাতীয় হার ১৮ শতাংশের তুলনায় যা অনেকটাই বেশি।

সবচেয়ে দ্রুত মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে অসমে। ২০০১-এ অসমের মোট জনসংখ্যার ৩০.৯ শতাংশ ছিল মুসলিম। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৩৪.২ শতাংশ। বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গেও মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ২০০১-এর ২৫.১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১১-তে হয়েছে ২৭ শতাংশ। এক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ১.৮ শতাংশ। জাতীয় ক্ষেত্রে (০.৮ শতাংশ) এই হারের বৃদ্ধির তুলনায় যা প্রায় দ্বিগুণ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, এ সংক্রান্ত তথ্য সংকলনের কাজ এখনও করছে রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ সেনসাস। মণিপুরই দেশের একমাত্র রাজ্য যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ৮.৮ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৮.৪ শতাংশ।

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১। মঞ্চে উপবিষ্ট আতিথিবর্গ, ভাষণরত তপন ঘোষ।
২। সংহতি কন্যাদের সঙ্গে স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী।
৩। ভাষণরত মাক্কাল কাচ্চির সভাপতি অর্জুন সম্পৎ।
৪। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্যরত আদিবাসী মেয়েরা।
৫। ভাষণরত বৌদ্ধভিক্ষু করুণালঙ্কার।
৬। জেহাদী আক্রমণের চিত্র
৭। সমাবেশের একাংশ।
৮। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কর্মীরা।
৯। শিয়ালদহ থেকে এল ৩০০০ কর্মীর মিছিল।
১০। হিন্দু সংহতির সভাপতিকে সম্বর্ধনা।
১১। সংহতি কর্মীদের একাংশ।
১২। সংহতি কন্যা ও পরের প্রজন্ম।
১৩। অতিথিবরণ।
১৪। আদিবাসী নৃত্যের প্রস্তুতি।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686